দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মুখোশ খুলে গেছে —পৃঃ ১৪

বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান— পৃঃ ২২

৭০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ৬ নভেম্বর ২০১৭।। ১৯ কার্তিক - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

শতবর্ষের আলোয় বসু বিজ্ঞান মন্দির

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ১৯ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৬ নভেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

ডেঙ্গিশ্রী, ডি.লিট মুখ্যমন্ত্রীর চরণামৃত পান বাধ্যতামূলক করা হোক ▯ গূঢ়পুরুষ▯ ১০

খোলা চিঠি : ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন, সরকার থেকে দূরে থাকুন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

সন্ত্রাসবাদীদের ৯৯ শতাংশ কেন মুসলমান ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ১২

তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে গেছে ▯ সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৪

সংখ্যালঘু মৌলবাদকে আড়াল করলে আখেরে তাদেরই অনিষ্ট ▯ বরুণ দাস ▯ ১৬

শতবর্ষের আলোয় বসু বিজ্ঞান মন্দির ▯ বিশ্বজিৎ মণ্ডল ▯ ১৯

বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান ▯ নির্মল মাইতি ▯ ২২

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি ▯ এ পানাগড়িয়া ▯ ২৭

জড় চৈতন্যের যুদ্ধজয়ী প্রভু জগদ্বন্ধু ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

হিন্দু বাঙালি প্রথায় ইলিশ বাঁচান ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩২

দেশপ্রেমিক চারণকবি মুকুন্দদাস ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩৩

বরিশাল ফিরোজপুরের রামকাটি আশ্রমের ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** ▯ **খেলা : ৩৮** ▯ **অন্যরকম : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা ও শব্দরূপ : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস

তাজমহল কি সত্যিই শাহজাহানের তৈরি? একে কি শাহজাহান-পত্নী মুমতাজ মহলের সমাধি বলা চলে? বিগত কয়েকশো বছরে মাঝেমাঝেই তাজমহলের প্রকৃত নির্মাণেতিহাস নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। স্বাধীনোত্তর দেশি ঐতিহাসিকরা সত্যের মূলানুসন্ধান না করে তাকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন ড. প্রসিত রায়চৌধুরী।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

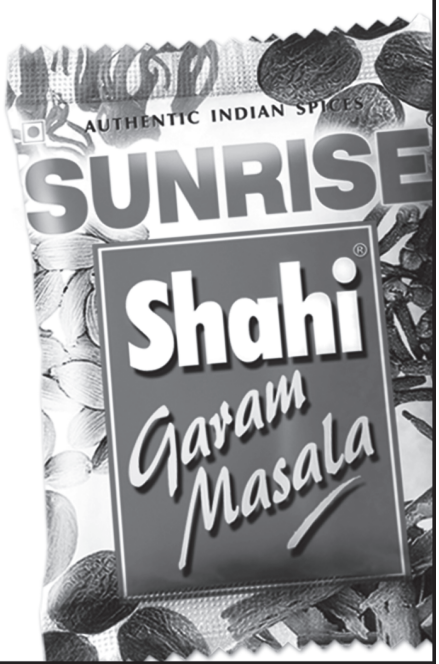

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুখোশের অন্তরালে

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি. চিদাম্বরম মহাশয় সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন কাশ্মীরের মানুষ আজাদি চান, সুতরাং সেখানে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। দেশের প্রাক্তন এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর এহেন বাচন শুনিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক বিস্ময়ের কিছু নাই। পায়ের তলার মাটি ক্রমশ আলগা হইলে মুখোশের কার্যকারিতা লুপ্ত হয়, প্রকৃত মুখটি দেখা যায়। স্মরণে থাকিতে পারে আফজল গুরু নামক এক সন্ত্রাসবাদী, সংসদে হামলাকারী জঙ্গির দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক ফাঁসির আদেশ রাতারাতি কার্যকর করিয়াছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। এই আদেশ দ্রুত কার্যকর করিতে আসামির বাড়ির লোকদিগের পর্যন্ত জানানোর সময় পায় নাই তারা। অথচ কিমাশ্চর্যম্! জে এন ইউ-তে এই সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন বন্ধের প্রতিবাদে পথে নামিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী।

জমানা বদলেই তাহাদের ভোল বদল, কিংবা যেন-তেন-প্রকারেণ গদিতে ফিরিবার চেষ্টা ইহা ভাবিলে সূত্রের অতি সরলীকরণ হইবে। ইহাই প্রকৃত 'কংগ্রেস (ইন্দিরা)'; ইহাই তাহাদের প্রকৃত মুখ। ক্ষমতায় আসিলে দেশের সম্পত্তি লুঠ করার তাগিদে তাহাদের দেশপ্রেমের 'মুখোশ' পরিতে হয়, আর দেশবাসী নির্বাচনে তাহাদের পর্যুদস্ত করিলে তাহাদের অনুগত বাম ঐতিহাসিকেরা দেশদ্রোহী কংগ্রেসকে আড়াল করিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের গালগল্প ফাঁদিয়া বসেন। পরিস্থিতি তপ্ত বুঝিয়া চিদাম্বরমের মন্তব্য হইতে কংগ্রেস নেতৃত্ব এখন নিজেদের বিযুক্ত করিবার প্রয়াস লইয়াছেন কিন্তু তাহাদের যুবরাজের ক্ষেত্রে সেই সাহস অদৃশ্য হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের আজাদির কথা বলিয়া চিদাম্বরম যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত শক্ত করিলেন তাহাই নহে, বৈদেশিক শত্রুকেও উৎসাহিত করিলেন। আর এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়া গুজরাটে যে অপশক্তি ভোট ময়দানে নামিয়াছে, সেই মুমূর্ষু রোগীর অক্সিজেনের ব্যবস্থাটিও পাকা করিলেন। কারণ গুজরাটের রাজকোটে এক আলোচনা সভায় কাশ্মীরের এই আজাদির প্রসঙ্গ তিনি তুলিয়াছেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী কংগ্রেসকে কুলার হাওয়া দিয়া বিদায় করিবার পর কংগ্রেসের ভূমিকা আপাতত পরজীবীর। কখনো দেশদ্রোহী বামপন্থী, কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী, কখনো অপশক্তির সহিত হাত মিলাইয়া তাহারা যত খড়কুটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই স্বখাত সলিলে ডুবিতেছে।

আপাতত এছাড়া তাহাদের গত্যন্তরও নাই। কংগ্রেসি জমানার দুঃস্বপ্নকে অতীত করিয়া দেশজুড়ে আপাতত নূতন ভারত গড়িবার স্বপ্ন প্রবল। এই নবতর ভারতবর্ষে দেশবিরোধিতার স্থান নাই, ইহার অভিধানে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলিয়া কোনো শব্দের উল্লেখ নাই। কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষের মুখ্য পরিচয় তারা ভারতীয়। কাশ্মীর নামক সমস্যার সৃষ্টি চিদাম্বরমেরই রাজনৈতিক 'পূর্বসূরি'র হাত ধরিয়া। ইহাকে জিইয়ে রাখিবার চেষ্টা তাই তাঁহাকে করিতেই হইবে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই। এই প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং এই কর্তব্য ভারতের প্রতিটি নাগরিকের।

সুভাষিতম্

অগ্নৈব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।

সশিখিত্যুতে বিদ্বান্ ইতরেঃ কেশধারিণীঃ।। (ব্রহ্মোপনিষদ্)

যাঁর ভিতরে আগুনের শিখার মতো ব্রহ্মজ্ঞানের শিখা সর্বদা দীপ্যমান, তিনি হলেন যথার্থ শিখাধারী। অন্য যারা শিখাধারী তারা কেশভার বহন করে মাত্র।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগ
দেশি অস্ত্রনির্মাতাদের দীর্ঘমেয়াদি লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কিছু ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো দেশীয় পণ্য উৎপাদনে গতি আনা। সেই সঙ্গে দেশীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্য ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা। পণ্য উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের পাশাপাশি এবার মোদী সরকার দেশীয় অস্ত্রনির্মাতাদের উৎপাদন ঊর্ধ্বমুখী করার উদ্দেশে অস্ত্র আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, অস্ত্র আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগে আরও গতি আনতে দেশীয় অস্ত্রনির্মাতা সংস্থাগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে কর্মসংস্থান আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। অস্ত্রআইনের পরিবর্তন করে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে শামিল করতে পারলে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে মনে করছে কেন্দ্র।

সংশোধিত অস্ত্রআইনে বলা হয়েছে :

(১) লাইসেন্স প্রাপ্ত (অথবা যারা ভবিষ্যতে লাইসেন্স পাবেন) যে সব সংস্থা অস্ত্রনির্মাণ করে থাকেন তাদের লাইসেন্স এখন থেকে 'আজীবন' বৈধ থাকবে। পাঁচ বছর অন্তর নবীকরণ করালেই চলবে।

(২) যে সব সংস্থা ছোট এবং হালকা অস্ত্র তৈরি করে তারা তাদের উৎপাদন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বিক্রি করতে পারবে। তবে তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আগাম অনুমতি প্রয়োজন।

(৩) লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থাকে জানিয়ে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য আলাদা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর প্রয়োজন নেই।

(৪) লাইসেন্স ফি'র হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো হয়েছে। আগে যে কোনও অস্ত্রের সর্বনিম্ন লাইসেন্স ফি ছিল ৫০০ টাকা। ভারী অস্ত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত (যা অত্যন্ত চড়া) লাইসেন্স ফি লাগত। সেইসঙ্গে আলাদা লাইসেন্সও লাগত। নতুন আইনে সর্বনিম্ন লাইসেন্স ফি ৫০০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা। এই লাইসেন্স ফি পৃথকভাবে প্রত্যেক অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সংস্থার উৎপাদনের আয়তন অনুযায়ী স্থির করা হবে লাইসেন্স ফি।

(৫) লাইসেন্স ফি জমা দিতে হবে আবেদন করার সময়।

(৬) যদি কোনও সংস্থার একই রাজ্যে একাধিক কারখানা থাকে অথবা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা থাকে তাহলে প্রত্যেক কারখানার জন্য আলাদা লাইসেন্স লাগবে না, একটি লাইসেন্স নিলেই চলবে।

এই নতুন আইন যে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করবে সে বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এই আইনের ফলে দেশে বিশ্বমানের অস্ত্রনির্মাণ যেমন সম্ভব হবে, ঠিক তেমনি সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী সঠিক অস্ত্রটি দেশেই পেয়ে যাবে।

সর্দার প্যাটেলের জন্মশতবর্ষে একতা দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়ামে বিশেষ ম্যারাথন দৌড়ের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিশেষ দৌড়ের নাম একতা দৌড়। এবার থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনটি জাতীয় একতা দিবস হিসেবে পালিত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার আগে এবং তার পরে দেশগঠনে সর্দার প্যাটেলের অবদানের কোনও

সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর জন্য আমরা সবাই গর্বিত।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একতা দৌড়ে দীপা কর্মকার, সর্দার সিংহ, সুরেশ রানা, কারনাম মালেশ্বরী-সহ দেশের স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদরা অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ বলেন, লোকে নাকি সর্দার প্যাটেলকে ভুলে গেছে! কিন্তু আমি তো দেখি ভারতের অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বারবার উঠে এসেছে ভারতের বহু সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয়তার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা। এদিন, একতা দৌড় শুরু হবার আগে প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের সমাধিস্থলে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ মাসের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের মানুষকে একতা দৌড়ে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান। তাতে যে সাড়া মিলেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

অন্ধ্রের কৃষকদের সিঙ্গাপুরে শিক্ষা-ভ্রমণ

মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু যাত্রার শুভ সূচনা করছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অনেকদিন আগেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের নির্বাচিত কৃষকদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে কৃষি-প্রযুক্তি শেখার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠানো হবে।

সম্প্রতি চন্দ্রবাবু নাইডুর উপস্থিতিতে কৃষি-শিক্ষার্থীদের প্রথম ব্যাচ সিঙ্গাপুর রওনা হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ১২৩ জনের একটি দলকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের জন্য। চন্দ্রবাবু নাইডু জানান, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে তিনি যেসব কর্মসূচি রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই তিনি করে দেখাবেন। তার সরকারকে অবিরাম সমর্থন করে যাবার জন্য তিনি কৃষকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই প্রথম মালবাহী ট্রাক সমুদ্রপথে যাত্রা করল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবহণের ইতিহাসে এই প্রথম চেন্নাই বন্দর থেকে ১৮৫টি খালি ট্রাকের ভারি চেসিস নিয়ে বাংলাদেশের মঙ্গলা বন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ভারতের একটি জাহাজ। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক কোস্টাল শিপিং

যাত্রার শুভারম্ভ করছেন নীতিন গড়করি।

চুক্তি অনুযায়ী এটিই প্রথম জলযাত্রা।

সূত্র অনুযায়ী জাহাজটির মঙ্গলা বন্দরে পৌঁছতে সময় লাগবে ৫ দিন। এই ১৮৫টি চেসিসের স্থলপথে সেদেশে পৌঁছতে সময় লাগত ২০ থেকে ২৫ দিন। ভারতের ভারী গাড়ি তৈরির কোম্পানি অশোক লেল্যান্ডের এই রপ্তানি প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করে ভারতের জাহাজমন্ত্রী নীতীন গড়করি বলেন, জলপথে যাত্রা এই ট্রাকগুলিকে সম্মিলিতভাবে ৩ লক্ষ কিলোমিটার সফর থেকে বাঁচাল। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি চেসিসের সঙ্গে একজন করে চালকও লাগত।

বাস্তবে চেন্নাই থেকে পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্তে আসতে ট্রাকগুলির মাত্র ৫ দিন সময় লাগলেও সীমান্ত অঞ্চলে বিশালাকার ট্রাফিক জমে থাকা ও কাসটম ছাড়পত্র নিয়ে ১৫ থেকে কুড়ি দিন সাধারণত লেগে যাওয়ায় ২৫ দিনের আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রাক কখনই পৌঁছতে পারত না। অশোক লেল্যান্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী সীমান্তের এপারে প্রায় ৩৫০০ বাংলাদেশমুখী ট্রাক সদা অপেক্ষমান থাকে। গড়ে ৩০০ ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশ ঢুকলে ১০০ বাংলাদেশি ট্রাক প্রত্যহ ভারতে ঢোকে।

কর্তৃপক্ষ আরও বলেন জলপথে যাওয়ার ফলে গাড়িগুলির দীর্ঘ স্থলপথ যাত্রাজনিত স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি (natural wear & tear) এড়ানো যাবে, কেননা প্রত্যেকটি ট্রাককেই ন্যূনতম ১৭০০ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে হয়। শুধু তাই নয় এতে বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমনের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ওই জাহাজটিতে অন্য আরও মালপত্র নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ চলছে। তেমনি বাংলাদেশ থেকে ফিরতি পথে আমদানির মালপত্র আনতে পারলে ব্যবসায়িক লাভ আরও বাড়ার সম্ভাবনা।সূত্র অনুযায়ী লেল্যান্ড কোম্পানি বছরে বাংলাদেশকে ৬ হাজার ট্রাক সরবরাহ করে, যে সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে খবর।

নীতীন গড়কড়ি এদিন অটোমোবাইল উৎপাদকদের জলপথ পরিবহণ ব্যবহারের আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ও পণ্য উভয়ক্ষেত্রেই উৎসাহ দিতে পরিবহণ খরচের ওপর বিশেষ ছাড় ঘোষণা করেন।

জেহাদি সঙ্গ ছাড়তে নারাজ কমিউনিস্ট চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সন্ত্রাস দমনে যে তারা একেবারেই আন্তরিক নয়, বরং ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসে মদত দেওয়াই যে তাদের রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ তা আরও একবার পরিষ্কার করে দিল চীন। জি জিনপিঙের নিরঙ্কুশভাবে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে নরম মনোভাব নিল চীন। ইতিপূর্বে ব্রিকসের মঞ্চে তারা পাক-সন্ত্রাস নিয়ে সরব হলেও তা ছিল ভারতের কূটনৈতিক কৌশলের কাছে নতি স্বীকার এমনটাই মনে করে আন্তর্জাতিক মহল। কিন্তু এর ফলে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ও ভারত-বিরোধী রাষ্ট্রনীতির যে কোনও পরিবর্তন তারা করবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছে চীনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র হুয়া চুনইং। সম্প্রতি ৩০ অক্টোবর এক সংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা কাউন্সিলে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদীর তালিকায় মাসুদ আজহারের নাম থাকার প্রসঙ্গ উঠলে চুনইং বলেন কোনো দেশ কারোর নাম নিষিদ্ধ করলে চীন তার সঙ্গে সহমত নাও হতে পারে।

২০১৬-র ২ জানুয়ারি পাঠানকোট হামলায় জড়িত থাকার মূল চক্রী হিসেবে ভারত মাসুদ আজহারকে চিহ্নিত করেছে। সেনাবাহিনীর সাত জওয়ানের হত্যার ঘটনায় মাসুদের ভাই রউফ ও অন্যান্য পাঁচ জঙ্গির বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণও ভারতের হাতে রয়েছে। মাসুদকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে তার সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া ও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া বন্ধ করার জন্য এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ১২৬৭ জন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীর তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করে ভারত। ভারতের আবেদনে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পনেরো সদস্যের মধ্যে চোদ্দজনই সাড়া দিলেও একমাত্র চীনের আপত্তিতেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় মাসুদ আজহারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

গত আগস্টে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড মাসুদকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিলেও চীন বিষয়টি পিছিয়ে সামনের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে যায়। আল কায়দার অনুমোদন প্রাপ্ত জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-এ-মহম্মদ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ জঙ্গি-সংগঠনের তালিকায় থাকলেও তাদের প্রধান মাসুদ নিষিদ্ধ জঙ্গিদের তালিকায় নেই চীনের সহযোগিতাতেই। আর কমিউনিস্ট চীন যে তাদের দোসর জেহাদিদের সঙ্গ ছাড়বে না সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে বারেবারেই।

ডেঙ্গু নিয়ে মমতার ডিগবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পরিসংখ্যান দিয়েছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকা স্বাস্থ্য দপ্তর। বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা ৩৮। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্যে জল ঢেলে জানালেন মৃতের সংখ্যা ৩৮ নয় ১৩। কারণ বেসরকারি হাসপাতালে মৃত ২৭ জনের তথ্যে তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না। বেসরকারি ল্যাবরেটরি ভুলভাল রিপোর্ট দিচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। এগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি 'নিশ্চিত' না হয়ে সরকারি পরিসংখ্যানে তা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তাঁর কথা, 'এইসব মৃত্যু ডেঙ্গুর জন্যেই হয়েছে কিনা তা কনফার্ম (নিশ্চিত) হয়েই বলা সম্ভব।' সেই সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুর প্রকোপের দায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ওপর তো বটেই, ভুটান এবং বাংলাদেশের ওপরও চাপিয়েছেন। আবহাওয়া এবং ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশার চরিত্রবদলও এর জন্য দায়ী বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'ওড়িশা অসম ঝাড়খণ্ড বিহার ভুটান বাংলাদেশে কিছু হলে পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব পড়ে। মশা তো কেউ আমদানি করে না। মশা রাস্তা পরিবর্তন করেছে তাই এ রাজ্যে ডেঙ্গু হচ্ছে।'

মণিপুরে বিজেপি ঝড়
ছয় জেলা পরিষদে পদ্মফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি মণিপুরের ৬টি জেলা পরিষদে নির্বাচন হয়ে গেল। ছ'টিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহ নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলা পরিষদের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। সূত্রের খবর, নাওরিয়া পাখাংলাকপা জেলা পরিষদের সদস্য আর কে তারানি ইম্ফল পশ্চিম জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। তাকিয়েল জেলা পরিষদের নাগাসেপাস বিমলা নির্বাচিত হয়েছেন উপাধ্যক্ষ। আর কে তারানি মোট আটটি ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এল ববি দেবী পেয়েছেন ৬টি ভোট। মোট ভোট ১৪টি। অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের আগে ইম্ফলের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোদী সরকার উত্তরপূর্বাঞ্চলকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সেইদিক থেকে এই জয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অনুপ্রবেশ এবং জঙ্গি সন্ত্রাস দমনে সরকার অনেক বেশি সদর্থক ভূমিকা নিতে পারবে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

উবাচ

"সংসদ যে আইন (আধার আইন) পাশ করেছে তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রাজ্য সরকার কীভাবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে পারে? ব্যক্তির পক্ষে যা করা সম্ভব সরকার তা করতে পারে না।"

অশোক ভূষণ ও এ.কে. সিক্রি
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

আধার আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলা প্রসঙ্গে

"পাকিস্তান বিরোধিতা করলেও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভারত লাগাতার চেষ্টা করে যাবে।"

এ.কে. ভাট
লেভটেন্যান্ট জেনারেল

ভারত-পাক সীমান্তে পাকিস্তানের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে

"কংগ্রেস শাসনে হিমাচলপ্রদেশ দেবভূমি থেকে অপরাধভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে এখন বনজ ও খনিজ সম্পদের লুঠ চলছে। বাড়ছে ড্রাগ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। মানুষ হিমাচল থেকেও কংগ্রেসকে বের করে দেবে।"

যোগী আদিত্য নাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

হিমাচল প্রদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে

"রাজ্যে মহামারীর আকার নিয়েছে ডেঙ্গু। মোকাবিলা করা তো দূরের ব্যাপার, রাজ্য সরকার তথ্য গোপন করতেই ব্যস্ত।"

দিপীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সম্পাদক

ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য সরকারের গা-বাঁচানো মনোভাব প্রসঙ্গে

ডেঙ্গিশ্রী, ডি.লিট মুখ্যমন্ত্রীর চরণামৃত পান বাধ্যতামূলক করা হোক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কন্যাশ্রী সামাজিক প্রকল্পের স্বীকৃতি দিতে তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি দেওয়া হবে। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনি বাংলাভাষার সুবিখ্যাত লেখিকা। তিনি সত্তরটি বই লিখেছেন। সেসব বই নাকি 'হট কেক'-এর মতো বাজারে বিক্রি হয়। তাঁর বই বিক্রির রয়্যালটিতে তৃণমূল দলের সব খরচ চলে। অতীতে যেমন তাঁর আঁকা ছবি বিক্রির টাকায় চলতো তাঁর দল। সারদা আর রোজভ্যালি চিটফান্ড কেলেঙ্কারির জেরে মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি আর বিক্রি হয় না। তাই মুখ্যমন্ত্রীও আর ছবি আঁকেন না। কোটি টাকায় সারদার মালিক সুদীপ্ত সেন দিদির আঁকা ছবি কিনতেন। সেই সুদীপ্ত সেন এখন জেলে পচছেন। সেটাই প্রত্যাশিত। লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষের টাকা মেরে দিলে এমন শাস্তিই ঈশ্বর দেন। ডিভাইন জাস্টিস। প্রতারিত মানুষের টাকায় দিদির আঁকা ছবি চিটফান্ডের রাঘব বোয়ালরা কিনতেন। আর সেই টাকায় তৃণমূল দলটা চলতো। দিদি ভাবতেন তিনি কালীঘাটের পটুয়া পাড়ার মস্তবড় একজন পটুয়া। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট হয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন যে তিনিই বাংলার জনপ্রিয়তম লেখিকা। ভারতের কোনো রাজনীতিক এত বই লেখেননি। ভারত কেন, সারা বিশ্বেই কোনো রাজনীতিক ৭০টি বই রচনা করেননি। মমতা দিদি হাওয়াই চটি পরে যে গতিতে হাঁটেন তার চেয়েও দ্রুতগতিতে লেখেন। আর লেখা চলার সময়ে তাঁর চোখ এবং কান থাকে টিভির পর্দায় চলা বাংলা মেগা সিরিয়ালের রিপিট টেলিকাস্টে। রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত তাঁর লেখার কাজ এবং টিভি সিরিয়াল দেখা চলে। এমন বহুমুখী প্রতিভাকে অনেক আগেই ডি.লিট দেওয়া উচিত ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

উত্তর থেকে দক্ষিণ সারা রাজ্য যখন ডেঙ্গির দাপটে কাঁপছে তখন মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। ডেঙ্গির এমন মহামারী বাংলার মানুষ অতীতে দেখেনি। ডেঙ্গির দাপট নেই একমাত্র কালীঘাটের পটুয়া পাড়ায়। সেখানে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন মশা মারতে ধোঁয়া ছড়ানোর কামান আসে। নালা নর্দমায় মশা

গূঢ় পুরুষের কলম

মারার তেল ছড়ানো হয়। কারণ, দিদি মশারি টাঙিয়ে শুতে পারেন না। তাই সারা রাজ্যে ডেঙ্গিহীন এলাকা একমাত্র কালীঘাটের পটুয়াপাড়া। চলুন আমরা সবাই ডেঙ্গি থেকে রক্ষা পেতে পটুয়াপাড়ায় আশ্রয় নিই। মনে রাখবেন, ডেঙ্গির থেকেও দিদির দাপট বেশি।

সম্প্রতি কলকাতায় বিজেপি মহিলা মোর্চা এবং শিলিগুড়িতে যুব মোর্চা রাজ্যের সব কুচুটে বাঙালিকে পরপারে পাঠাতে তাঁর ডেঙ্গি আক্রমণ প্রকল্পের সাফল্যের জন্য দিদিকে 'ডেঙ্গিশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কন্যাশ্রী, ডেঙ্গিশ্রী, ডি.লিট তিনটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চলতি বছরেই তিনি পেয়ে গেলেন। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে তাঁর মুকুটে অন্য কী কী পালক লাগবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। এই প্রতিবেদক দিদির কয়েকটি অতি মূল্যবান অবদানের কথা বলতে পারেন। এক নম্বর, রাজ্যে যে কোনো রোগে মানুষের মৃত্যু হলে চিকিৎসকদের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটে আবশ্যিকভাবে লিখতে হবে মৃত্যুর কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। এতে মেডিক্যাল এথিকস্ লঙ্ঘন করা হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেই মৃত্যু হয়। তাই ভুলটা কোথায়? যেমন, ডেঙ্গি হলে রোগীর ডায়ারিয়া হবে। সুতরাং ডেথ সার্টিফিকেটে ডায়ারিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে সেখানে একটা বিপদ আছে। বিজেপি প্রচার করতে পারে রাজ্যে কলেরা বা আন্ত্রিক রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মৃত্যু হয়েছে লেখাটা অনেক নিরাপদ। দিদির মাথায় এমন বুদ্ধির জন্য তাঁকে 'মেধাশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা যেতে পারে।

দুই নম্বর, রাজ্য সরকারি কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতার পরিবর্তে বাড়তি ছুটি পাবেন। অর্থাৎ, যত শতাংশ ভাতা বকেয়া হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে সেই অনুপাতে সরকারি কর্মীরা অতিরিক্ত ছুটি পাবেন। টাকার বদলে ছুটিকে মুখ্যমন্ত্রী বিকল্প করতে চাইছেন। এতে প্রশাসনের কোনো ক্ষতি নেই। মুখ্যমন্ত্রী একাই তাঁর দল চালান। নির্বাচনের সময় বলেছিলেন সব বিধানসভা আসনেই তিনি তৃণমূলের প্রার্থী। তাঁর দলের রামা, শ্যামা, গদাইরা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল বলতে শুধু একা মমতা। বাকি সকলে ফালতু। একা দল চালাতে পারলে তিনি একাই প্রশাসন চালাতে পারবেন না কেন? এতে প্রশাসনিক খরচ কমবে। একেই বাজারে চার লক্ষ কোটি টাকা দেনা বকেয়া রয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্তা-কর্মী সকলকে ছুটি দাও। রোজ মিউ মিউ করে যারা মহার্ঘ ভাতা চাইছে ছুটি দিলে তারা নবান্নে এসে শান্তি ভঙ্গ করবে না। শুধু পুলিশকে ছুটি নয়। তবে পুলিশের একমাত্র কাজ হবে কুচুটে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বেধড়ক পেটানো। যে যত বেশি পেটাবে তার তত দ্রুত প্রমোশন হবে। তাই তাঁকে 'বিজেপি দলনী' উপাধি দেওয়া যেতে পারে। ▮

ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন, সরকার থেকে দূরে থাকুন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনারা সবাই জানেন যে, অসুখের থেকেও বিপজ্জনক হলো অসুখ গোপন করা। আর সেই গোপন করার খেলায় নেমে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার সেই বিপদকে ডেকে আনছে।

ডেঙ্গি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'বার মুখ খুলে যা বার্তা দিয়েছেন, তার সারমর্ম এই রাজ্যে ডেঙ্গি কোনও উদ্বেগের বিষয় নয়। কারণ, বিজেপি বা বামশাসিত রাজ্যগুলির থেকে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম। তাঁর বক্তব্য, বেসরকারি রক্ত পরীক্ষার ল্যাবগুলি কারসাজি করছে আর মিডিয়া বেশি হইচই করছে।

ব্যাস। হালকা করে মানুষকে সতর্ক থাকতে বললেও, যে মূল বার্তা তিনি দিয়েছেন তা যে কী ভয়ঙ্কর, সেটা কেউ বুঝুক না বুঝুক, চিকিৎসকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তৃণমূলের অলিখিত নিয়ম হলো--- দিদি ধরে আনতে বললে ভাইয়েরা বেঁধে আনবেই। শুধু ভাইয়েরা কেন, সরকারি আমলারও উঠে পড়ে লেগেছেন ডেঙ্গিকে সামান্য রোগ বলে প্রমাণ করতে। খবরের কাগজে পড়লাম এক চিকিৎসকের বক্তব্য— ''জ্বর ডেঙ্গি ভাইরাসের কারণে কিনা, কী চিকিৎসা করব, সব কিছুই যদি বাইরের লোক ঠিক করে দেয় বা চাপ দেয়, তাহলে ডাক্তারি শিখলাম কেন?''

এই পরিস্থিতিতে যা হচ্ছে তা হলো ডেঙ্গি নিয়ে সঠিক চিত্রটা পরিষ্কারই হচ্ছে না। কারণ, সঠিক তথ্যই তো পৌঁছাবে না সরকারের কাছে। সম্ভব নয়। মুখ্যসচিব মলয় দে যে তথ্য দিয়েছেনে তা হলো— এই বছরে মাত্র ১৮ হাজার ৮৪৩ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত (২৪ অক্টোবর, ২০১৭) হয়েছেন। এই তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য সন্দেহ জাগবেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্য প্রতিটি দেশেই ডেঙ্গির মতো রোগের পুরো চিত্রটা কখনওই পাওয়া যায় না তথ্যে লিকেজ থাকে। এখানে তো ভয়েই অনেকে ডেঙ্গির কথা উল্লেখ করতে পারছেন না।

এই তথ্য চেপে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গি আদৌ কতটা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে বা নিচ্ছে না, তা সরকার কি এই আধা-সত্য দিয়েই বুঝে যাবে! তাহলে তো ডেঙ্গির প্রকোপ ঠেকাতে কতটা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন তার কোনও হিসেব বা পরিকল্পনা সঠিক ভাবে করা সম্ভব নয়।

এর গুরুত্ব বোঝাও সম্ভব নয়। তাই তো দেগঙ্গার হাদিপুর ঝিকরা ২ পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লিচিং পাউডারের বদলে রেশনের ২ টাকা কেজির গমের আটা ছড়ানো হয়েছে। ধরা পড়তেই এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ঘরছাড়া হয়েছেন। তৃণমূল বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম তো ডেঙ্গিকে 'আল্লার' হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, ''আমাদের হাতে নেই। এটা তো আল্লার হাতে। তিনি যদি চান তবে হবে (ডেঙ্গি)।''

এই তো হাল। কোথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইদের নির্দেশ দেবেন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সাফাই ও সচেতনতা বাড়ানোর অভিযান করতে। তা নয়, শাসক দলের দাদারা 'তথ্য সাফাই' ও 'চমকানো' অভিযানে মন দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলেছেন। হয়তো নিজের অজান্তেই। তিনি বলেছেন ডেঙ্গিতে মৃত্যুর অনেকটাই জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়েছে। অর্থাৎ ডেঙ্গি ভাইরাস সক্রিয় থাকছে সারা বছরই। এটি একটি বিপদ সংকেত। চার ধরনের ডেঙ্গি ভাইরাসের মধ্যে কোন ভাইরাসটি সক্রিয় হচ্ছে এবং কোনটার তেজ কমে যাচ্ছে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা যথাযথ হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যাচ্ছে।

সুতরাং, বর্ষা শুরুর পরে জুলাই মাস থেকে শীত পড়ার নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়টা ডেঙ্গির মশার বেড়ে ওঠার আদর্শ হলেও সারা বছরই বিপদ থাকছে। কোন জ্বর ডেঙ্গি ভাইরাসের কারণে হচ্ছে, কোনটা 'অজানা জ্বরের' কারণে তার যথাযথ নজরদারি থাকা প্রয়োজন তার উপর গবেষণার ফলাফল রাজ্যের চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচার হওয়াও দরকার।

ডেঙ্গি রোগের দায় নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে মমতা 'অস্বীকারের রাজনীতি'-তে জড়িয়ে পড়লেন কেন? একটি মৃত্যুও যখন কাম্য নয় জানেন, তখন চিকিৎসকদের চাপে ফেলে দিলেন কেন? কেন অসৎ ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ডেঙ্গি নিয়ে পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে দিলেন।

বর্ষা বিদায় নিয়েছে। শীত চলে এলে ডেঙ্গির প্রকোপ কমবে। তার পরে সব ভুলে গেলে আসলে আমাদেরই বিপদ বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী সেই পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

সত্যিই দিদির জবাব নেই।

—সুন্দর মৌলিক

সন্ত্রাসবাদীদের ৯৯ শতাংশ কেন মুসলমান

প্রণব দত্ত মজুমদার

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সারা পৃথিবী বিস্ময়ে আতঙ্কে হতবাক হয়ে দেখল কীভাবে আমেরিকার গর্বের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' নামক গগনচুম্বী Twin Tower ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ওই একই বছরে ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় গণতন্ত্রের মন্দির সংসদভবন আক্রান্ত হলো। ৫ জন সন্ত্রাসবাদী ও ৯ জন নিরাপত্তারক্ষী মারা গেলেন। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর ১০ জন সন্ত্রাসবাদী ৩ দিন ধরে মুম্বই শহরের বিখ্যাত ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস, তাজমহল প্যালেস হোটেল, নরিম্যান হাউস ইত্যাদি জায়গা জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছিল; এতে ১৬৪ জনের মতো মারা যান এবং প্রায় ৩০৮ জন আহত হন। ভারতের প্রশিক্ষিত কম্যান্ডোদের ৩ দিন লেগেছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে। এ ঘটনাতেও সারা পৃথিবী হতচকিত হয়ে গেছিল। ২০১৬ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের সমুদ্রতটে 'Bastille Day' উপলক্ষে (ফ্রান্সের জাতীয় দিবস, ফরাসি বিপ্লবের সময় ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গের পতন হয়েছিল) মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন আতসবাজির রোশনাই দেখবেন বলে। এক সন্ত্রাসবাদী ১৯ টন ওজনের একটি বিশাল ট্রাক চালিয়ে দিল জমায়েত হওয়া মানুষের উপর। ৮৬ জন নিরীহ মানুষ মারা গেলেন, হতাহত বহু। ওই একই বছরের ডিসেম্বরে একই কায়দায় জার্মানির রাজধানী বার্লিনে Christmas-এর মার্কেটিং-এ মশগুল মানুষের উপর ট্রাক চালিয়ে ৯ জনকে পিষে দেওয়া হল, আহত ৫০ জনের মতো। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদীরা ছিল মুসলমান। দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই জড়িত মুসলমানরা।

অন্যধর্মের চিন্তাশীল লোকেরা বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলেন কেন এইসব সন্ত্রাসের ৯৯ শতাংশই ঘটাচ্ছে এই বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা? কী তাদের দর্শন, যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জগৎজোড়া ধ্বংসের কাজে মেতেছে এরা? তাঁরা ইসলাম নিয়ে পড়াশুনো লেখালেখি আরম্ভ করেছেন। আনোয়ার শেখ, আলি সিনা, তফায়েল আহমেদ, তারিক ফতে, তসলিমা নাসরিন, এম এ খান, এরকম কিছু মুক্তমনা প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে আরম্ভ করেছেন। বেশ কিছু বই ছাপা হয়েছে ইংরেজিতে; 'ইসলাম' বিষয়ক বাংলা বইও পাওয়া যাচ্ছে। এইসব বই থেকে যে সত্য উঠে আসে তা হলো— 'ইসলাম' ধর্ম গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা প্রচারিত ধর্মের মতো মানবপ্রেমের ধর্ম নয়। ওটি হলো বাহুর জোরে অন্য ধর্মের লোকেদের ইসলামে দীক্ষিত করে ইসলামের রাজ্য বিস্তারের ধর্ম। আমরা মনে করি 'ইসলাম' ধর্ম হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদির মতো আর একটি ধর্ম; আর আমরা শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত মত তত পথ'— এই কথাটিকে বেদবাক্যের মতো মান্য করি এবং সরল বিশ্বাসে 'ইসলাম'-এর পথকেও একটি ধর্মীয়পথের মান্যতা দিয়ে থাকি। আমরা মনে করি ইসলামও ধর্মীয়শান্তির পথ। আর আমাদের এই সরল বিশ্বাসের পথ ধরেই ঘাতকরা আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। যেমনটি হয়েছিল ১৯৪৬ সালে (১৬-১৯ আগস্ট) কলকাতায় ও ১০ অক্টোবর (প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে) নোয়াখালিতে। গত কয়েক বছর ধরে এই ঘাতকদের প্রত্যক্ষ করছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকার হিন্দুরা।

বিখ্যাত চিন্তাবিদ প্রয়াত সীতারাম গোয়েল বলেছেন— 'ইসলাম' সম্বন্ধে অ-মুসলমানদের অজ্ঞতাই মুসলমান জিহাদিদের শক্তির উৎস। 'ইসলাম' তত্ত্ব সম্বন্ধে অ-মুসলমানদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জিহাদিদের শক্তি হ্রাস ঘটবে। এই বিবেচনাতেই 'ইসলাম' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বিপদটা কোথা থেকে আসতে পারে জানা থাকলে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

পৃথিবী জুড়ে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা এই যে এত খুনখারাপি, রক্তারক্তি করছে সেটা তারা তাদের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ীই করছে। 'কোরান' এবং 'হাদিস' হলো ইসলামি শাস্ত্রের মূল আকরগ্রন্থ। কোরান ও হাদিসের মূলে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। (১) মিল্লাৎ ও কুফর (২) দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হার্ব (৩) জিহাদ। 'মিল্লাৎ' বলতে বোঝায় সৌভ্রাতৃত্ব। এই শব্দটির মাধ্যমে ধুরন্ধররা মানুষকে ভুল বোঝান। ওরা বলেন, 'দেখুন, ইসলামে সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে।' আসলে এই সৌভ্রাতৃত্ব কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব নয়। শুধু মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ দেশগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং অন্যান্য সমস্ত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার সব মুসলমান ভাই ভাই। কোরান বলছে— ''বিশ্বাসীগণ পরস্পরের ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো। (কোরান ৪৯/১০)''।

বাবাসাহেব আম্বেদকর লিখেছেন— ''ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব মানবজাতির জন্য নয়। এ হলো মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা এর বাইরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা'' (Babasaheb Ambedkar, Pakistan or partition of India-Govt. of Maharastra Publication)। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— ''মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা,

কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কোনো অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তার গলা কাটা যাবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে" ('জ্ঞানযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ)।

এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সারাটা সময় জুড়ে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলে গেছেন এবং তাঁর এই অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতির কারণেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেই গান্ধীজীর চিতাভস্ম সিন্ধুনদীতে বিসর্জন দিতে চাইলে সদ্যগঠিত ইসলামিক দেশ 'পাকিস্তান' তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল— ''এক কাফের কী রাখ (ভস্ম) সে হমে 'পাক' (পবিত্র) নদী 'না-পাক' (অপবিত্র) নহী করনি হ্যায়"। এর থেকেই জানা যায় ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্বের রূপটি কেমন।

ইসলামের মতে মানুষ দুই রকম। যারা আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে তারা হলো ইমানদার মুসলমান বা 'মোমেন'। আরবি শব্দ 'কুফর' মানে অবিশ্বাস করা বা বিরোধিতা করা। যারা আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদকে অবিশ্বাস করে বা তার বিরোধিতা করে তারা হলো 'কাফের'। আরবি শব্দ 'কুফর' থেকে কাফের।

কাফেরদের ধ্বংস করার বিধান আছে ইসলামে।

কোরানের দু-একটি আয়াত পড়লেই এটি অনুধাবন করা যাবে। ''কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য মতের অনুসরণ করলে তা কখনো গৃহীত হবে না এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবে (৩/৮৫)"। ''অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং ওরা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক (৯/১২৩)"। ''যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, তাদের শাস্তি হলো এই যে, তাদের হত্যা করো কিংবা শূলবিদ্ধ করো অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন করো (৫/৩৩)"। ''যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো (৪৭/৪)"। (বি. দ্র. একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে --- মুসলমান জিহাদিরা যখন অ-মুসলমানদের হত্যা করে, তখন তাদের গলা Slit করে। কোরানের নির্দেশ মেনেই এটা তারা করে।

ইসলামের মতে পৃথিবীতে দু' ধরনের দেশ আছে --- 'দার-উল- ইসলাম' ও 'দার-উল-হার্ব'। 'দার-উল-ইসলাম' হলো সেই সমস্ত দেশ যেখানে ইসলামের আইনকানুন মতো শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে, যেমন— পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, বাংলাদেশ-সহ প্রায় ৫৭টি দেশ। আর 'দার-উল-হার্ব' হলো যুদ্ধ বিগ্রহের দেশ; অর্থাৎ 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করার জন্য যে সমস্ত দেশে জিহাদিরা যুদ্ধ করছে। 'জম্মু ও কাশ্মীর' হলো এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

'দার-উল-হার্ব'-কে 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করার জন্য যুদ্ধ করা কট্টরপন্থী মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র একটি কাজ। ইসলামের রাজ্য বিস্তারের জন্য এই যুদ্ধকেই 'জিহাদ' বলা হয়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা একে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ ইত্যাদি বলে অন্য ধর্মের মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে— এটাও জিহাদের একটি কৌশল। 'জিহাদ' যারা করে তাদের বলে 'মুজাহিদ'। বহুবচনে 'মুজাহিদিন' অর্থাৎ আল্লার সৈনিক। ''আল্লার দৃষ্টিতে জিহাদের সমতুল্য কাজ আর কিছু নেই (৯/১৯)"। 'জিহাদ' যারা করবে তারা সবাই 'জন্নাতে' (স্বর্গে) যাবে এবং 'জন্নাতে' চূড়ান্ত ভোগবিলাসে দিন কাটাবে।

জিহাদ করে কাফেরদের ধ্বংস করার জন্য অত্যাচার করা, হত্যা করা, তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা, তাদের নারীদের ইজ্জত নষ্ট করা, তাদের যৌনদাসীতে পরিণত করা ইত্যাদি সবই ইসলামের মতে বৈধ ও পবিত্র কাজ। 'জিহাদ' করলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়তই লাভ। ইহলৌকিক লাভ হলো জিহাদিরা কাফেরদের ধনসম্পদ, তাদের রমণী-সহ লুটের মাল (যাকে বলে 'গনিমতের মাল') হিসাবে উপভোগ করতে পারবে; আর পারলৌকিক লাভ হলো জন্নাতে (স্বর্গে) গমন এবং সেখানেও পাবে রাজকীয় ভোগবিলাস এবং অসামান্য সুন্দরী হুরিদের সঙ্গে অফুরন্ত সঙ্গসুখ। এই কারণেই হাজার হাজার জিহাদিরা অবলীলায় প্রাণদান করে।

কোনো মুসলমানের পক্ষে জিহাদে শহিদ হওয়া এতই আকর্ষণীয় যে একজন মুজাহিদ বলবে— ''আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে শহিদ হব, এবং শহিদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠবো এবং শহিদ হব, শহিদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠবো এবং শহিদ হব, শহিদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠবো (বোখারি-৪, ৫৪)"।

আরেক মুক্তমনা প্রগতিশীল লেখক এম এ খান তাঁর পুস্তক 'জিহাদ-' এ লিখেছেন— ''সহিংস জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ, যা বিনা ইসলাম হয়তো বা সপ্তম শতাব্দীতেই মৃত্যুবরণ করতো। নবির ইসলাম বিস্তারের এ আদর্শ প্রক্রিয়া তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফা ও শাসকবর্গ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রহণ ও তার বাস্তব প্রয়োগ করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ইসলামের শিক্ষা হলো অবিশ্বাসীদের (বিধর্মী বা কাফেরদের) ধ্বংস করে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করার শিক্ষা। এই উপমাহাদেশের হিন্দুরা যদি এ কথা অনুধাবন করতে না পারে তবে ইসলামের হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।

তথ্যসূত্র :

(১) ইসালমি ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা— ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(২) এক নজরে ইসলাম --- ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩) জিহাদ— এম এ খান।

(৪) ইসলামি শান্তি ও বিধর্মী সংহার— নুসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা।

(৫) নিঃশব্দ সন্ত্রাস— রবীন্দ্রনাথ দত্ত।

তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে গেছে

সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রথম আমরা বুঝতে পারিনি, এদের অভিনয়টাকেই আসল চরিত্র ভেবেছিলাম, আজ যেহেতু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, এখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমরা যারা অসি ধরতে অক্ষম, তাদের মসিকে অবলম্বন করেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

তথাকথিত প্রগতিশীল মানবদরদি বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকান। এরা চরম হিন্দু বিদ্বেষী এবং অবশ্যই 'দেশপ্রেম' শব্দটি এদের অভিধানে নেই। এরা ভারতের খাবে, ভারতের পরবে, ভারতের সম্পদ ব্যবহার এবং অপব্যবহার করবে, ভারতের সংবিধান-প্রদত্ত যাবতীয় সুযোগ- সুবিধা চুটিয়ে উপভোগ করবে, অথচ এদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, এদের আনুগত্য অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে যদি তাকাই, কী দেখতে পাচ্ছি? ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে, মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এই সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যারা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে ছলে, বলে, কৌশলে— তারা সকলেই যে অভাবের তাড়নায় এদেশে চলে আসছে তা নয়। এদের একটা বড় অংশ জামাতিদের দ্বারা প্রেরিত সন্ত্রাসবাদী। বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে, বাংলাদেশের সরকার ফেলার আয়োজন করছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বসে। খাগড়াগড় এর অন্যতম উদাহরণ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং ওই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলদের সমর্থন রয়েছে এর পেছনে। পশ্চিমবঙ্গের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত।

মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দু জনগণ আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন ও মানবতার ধ্বজাধারী সিপিএম, কংগ্রেস মরিয়া হয়ে মুসলমান তোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতি বসুরা যেটা শুরু করেছিলেন, মমতা সরকার সেই ধারাটি শুধু অব্যাহত রাখেনি, আরও বেগবতী করে দিয়েছে, পূর্বতন সরকারকে টেক্কা দেবার জন্য। কারণ এরা তো ভোটব্যাঙ্ক, এদের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই লাভ, দেশ চুলোয় যাক।

আজ তোষণনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দুর্গাপূজার বিসর্জনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। নবিদিবস উদ্‌যাপন না করলে স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ রাখার ফতোয়া জারি করা হয়। সরস্বতী পূজা করতে চাওয়া ছাত্রীদের মাথায় পুলিশের লাঠি তাদের রক্তপাত ঘটায়।

আমাদের প্রগতিশীল, মানবতাবাদী লিবারেল বুদ্ধিজীবীর দল বাবরি ধাঁচা নিয়ে আজও কেঁদে চলেছে। অথচ দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় ২০১০ সালে জেহাদিরা অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করল, খুন করল, ক্যানিংয়ে ২০১৩ সালে মুসলমান গুণ্ডারা শতাধিক মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল, ২০১৫ সালে নদিয়ার কালিগঞ্জ ব্লকে, ২০১৬ সালে মালদার কালিয়াচকে, বীরভূমের ইলামবাজারে, হাজিনগরে, বর্ধমানের কাটোয়ায়, হাওড়ার ধুলাগড়ে হিন্দুদের ওপর নৃশংস আক্রমণ হলো, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, দোকানপাট লুট করা হলো, মন্দির ধ্বংস করা হলো, বিগ্রহ অপবিত্র করা হলো, হতাহতের কোনও সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া গেল না, মিডিয়ার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো, কারণ আক্রান্তরা সকলেই ছিল হিন্দু, যে কারণে প্রগতিশীলরাও চুপ। সাম্প্রতিককালে হরিয়ানায় ট্রেনের কামরায় জুনেইদ খান নামে একটি ছেলেকে কিছু দুষ্কৃতী পিটিয়ে মারে। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু সমাজের মানুষ ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে। এটাই তো স্বাভাবিক। আশ্চর্য লাগল যখন টেলিভিশনে দেখলাম প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল চলেছে, যেখানে লেখা 'India is a lyrching state', ভারতের বিভিন্ন শহরে মিছিল বেরোলো। মিছিলের উদ্যোক্তারা নিজেদের গ্রুপের নামবহনকারী ব্যানার তুলে ধরেছিল যেখানে লেখা ছিল, "Not In My Name"। ওই প্রতিবাদ-মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন একজন মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতা যাঁর নাম সাবা

দেওয়ান। মিছিলে কিছু সেলিব্রিটিকে দেখা গেল, যেমন শাবানা আজমি, অপর্ণা সেন, নন্দিতা দাস প্রমুখ যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল লিবারেল বলে প্রচার করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুরা যে আক্রান্ত হচ্ছে, ঘরবাড়ি হারিয়ে ত্রিপলের নীচে দিনাতিপাত করছে, হতাহত হচ্ছে, হিন্দু মেয়েরা মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছে, কই, সেসব ক্ষেত্রে তো ''Not In My Name"কে দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত! কেন এই দ্বিচারিতা? পুরস্কার ফেরত দেওয়া সেলিব্রিটিরাই বা কোথায়?

এই ভণ্ড প্রতিবাদীরা দেশের কতটুকু খবর রাখে? বসিরহাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় কার্তিক ঘোষ নামে এক প্রবীণ মানুষকে কুপিয়ে মারা হলো, তিনি কাজ সেরে দিনের শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর জন্য তো মানবতাবাদী, প্রগতিশীলের দল টুঁ শব্দ করলো না? মিছিল তো দূরের কথা। কার্তিক ঘোষ ছিলেন হিন্দু, সেটাই ছিল গুণ্ডাদের কাছে তাঁর পরিচয়।

২০১৫ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার ধর্মতলায় দিনদুপুরে রাস্তার ওপর গোরুর মাংস খাওয়ার উৎসব হলো। ঘটনাটি অভিনব। ইতিপূর্বে এরকম ঘটনা কখনো কি ঘটেছে? এই উৎসবের উদ্যোক্তা 'ভাষা ও চেতনা' গোষ্ঠীর সম্পাদক ইমানুল হক। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন— যেমন রং বদলানো কবি সুবোধ সরকার, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, এই ভাবে কোনও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈ হৈ করে শুয়োরের মাংস খেতে পারবেন কি? তা কী করে সম্ভব? এক তো, মুসলমান ভাবাবেগে আঘাত লাগবে, আরেকটা কারণ হলো— লাশ পড়ে যেতে পারে। হিন্দুদের ভাবাবেগকে থোড়াই কেয়ার।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাদের আদিভূমি থেকে মেরে কেটে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। দেড় লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত মৃত্যুবরণ করলো। আড়াই লক্ষ কোনও রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসে আজ পঞ্জাবে, দিল্লিতে তাঁবুর নীচে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছে। প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর দল এদের জন্য কখনো মিছিল করেছে কি? প্রতিবাদ জানাতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত পুরস্কার ফেরত দিয়েছে কি? দেয়নি, কারণ এই নিপীড়িত মানুষগুলি ধর্মে হিন্দু। কাশ্মীরের বুদ্ধিজীবীরা, যেমন ইনাসুল নবি, মাজিদ হায়দারি, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট শবনম লোন প্রমুখ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতি এক ফোঁটা সহানুভূতি দেখায়নি কোনওদিন, অথচ আজ এরা হিন্দু বিদ্বেষী কিন্তু ধর্মে হিন্দু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য হাহাকার করছে। যারা মায়ানমার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ভারতে ঢুকছে, অসমে পশ্চিমবঙ্গে ও জম্মুতে গেঁড়ে বসেছে, যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং কুখ্যাত কিছু সন্ত্রাসবাদী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রতি বুকভরা ভালবাসা নিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে এরা বলছে— ''এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে''। সত্যি সত্যি নিজের বাড়িতে এরা রোহিঙ্গাদের মোটেও ঢুকতে দেবে না, শুধুই মোদী সরকারকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য এবং ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য এই দরদ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যাঁর তোষণনীতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তিনি তো রোহিঙ্গাদের বরণ করে ঘরে তোলা শুরু করে দিয়েছেন, ভবিষ্যতের ভোটার হিসেবে।

এদেশের অনেক মানুষ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, বলে থাকেন যে ইসলাম হলো 'শান্তির ধর্ম'। উদাহরণ স্বরূপ মিরাতুন নাহারদের নাম করা যেতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাবা নাকভিরও এই মত। কতিপয় মোল্লাদের বাড়াবাড়ির জন্যই নাকি তাদের ধর্মের বদনাম হচ্ছে। যে ধর্ম এই পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজকে পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ করে --- স্বধর্মী (মুসলমান) ও বিধর্মী (কাফের), সেই ধর্মের তো গোড়াতেই গলদ। এ বিষয়ে মিরাতুন সাহেবারা কিছু বলেন না কেন? এ কারণেই তো বাংলাদেশে হিন্দুদের কাফের বা মালাউন বলা হয় এবং তাদের উপর অত্যাচার চলে। তারা কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাতে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হন। এ ব্যাপারে Not In my Name-ওয়ালারা টুঁ শব্দ করে না। তাদের মানবিকতা এতটাই selective যে কাশ্মীরে মসজিদের ব্যালকনি থেকে সন্ত্রাসবাদী নেতা যখন জনতাকে ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত করে, যার ফলে শ্রীনগরের ডিএসপি আয়ুব পণ্ডিতকে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে, তখন 'নট ইন মাই নেম'-ওয়ালারা বোবা কালা সেজে থাকে। নিরীহ অমরনাথ যাত্রীদের যখন হত্যা করা হয়, তখন এই সব প্রগতিশীল ভণ্ডরা যে যার গর্তে লুকিয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এই মুহূর্তে সব থেকে ভয়ানক বলে মুহূর্তে মনে হয়। ১৯৪৭-'৪৮ সালে এখানে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯ শতাংশ আজ সেই সংখ্যা হু হু করে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে। যে পশ্চিমবঙ্গ জন্ম নিয়েছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টায়, মার খাওয়া নিরীহ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য, আজ সেই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল। হিন্দুদের পরিচয় তারা কাফের, সরকার তাদের সঙ্গে নেই। ড. আম্বেদকার বলেছিলেন, 'ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়। এ হলো মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা এর বাইরে, তাদের জন্য আছে ঘৃণা ও শত্রুতা' (Pakistan or Partition of India– Publisher : মহারাষ্ট্র সরকার।

দুর্ভাগ্যবশত এদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল কমিউনিস্টরা, 'নট ইন মাই নেম'-ওয়ালারা বেশিরভাগই হিন্দু। এরা জানে না যে মুসলমানদের কাছে তারা শুধুই কাফের, যতই তারা মুসলমান তোষণ করুক না কেন। আয়াতুল্লা খোমোইনির একটি কথাতেই তা পরিষ্কার—

''জিহাদের অর্থ হলো, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলকে জয় করা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র কোরানের আইন বা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের অন্তিম লক্ষ্য''। ■

সংখ্যালঘু মৌলবাদকে আড়াল করলে আখেরে তাদেরই অনিষ্ট

বরুণ দাস

এটা আজ জলের মতোই পরিষ্কার যে, সংখ্যাগুরু মৌলবাদ নিয়ে আমরা যতটা সরব, সংখ্যালঘু মৌলবাদ নিয়ে ঠিক ততোটাই নীরব! বিশেষ করে এদেশের রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সহ বিশিষ্টজনেরা— সবাই এ বিষয়ে একই পথের পথিক। মৌলবাদ তা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তা মানবতা ও মনুষ্যত্বের পক্ষে সমান আশঙ্কার। কিন্তু প্রগতিশীলতার আড়ালে আমরা এক সম্প্রদায়ের মৌলবাদ নিয়েই এতকাল সরব হয়েছি। অন্য সম্প্রদায়ের মৌলবাদকে না-দেখার ভান করেছি।

কিন্তু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতা ও মনুষ্যত্বের সামগ্রিক স্বার্থেই আমাদের অতি-'প্রগতিশীলতা'র কৃত্রিম মুখোশটা আজ খুলে ফেলা দরকার। নাহলে যে অপরিসীম ক্ষতির মুখোমুখি আমরা হবো— তার সঠিক হিসেব দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না। ক্ষতিটা বেশি হবে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই। তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আড়ালে আমরা এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকটাই ক্ষতি সাধন করে ফেলেছি। আর যাতে না হয় সেদিকে এবার নজর দেওয়া দরকার।

কীভাবে আমাদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরপরাধ মানুষ? আমরা রাজনীতির স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। আমাদের ধারণা, এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ধর্মের মৌলবাদীদের দ্বারা চালিত হন। তাদের আদেশ- নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই ভোটের স্বার্থে ওই সম্প্রদায়ের কট্টর মানসিকতার মোল্লা-মৌলবিদের 'তোল্লা' দিয়ে চলাটাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি।

এই অপরিসর নিবন্ধে এমন কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে মোল্লা-মৌলবিদের তোল্লা দেওয়ার কুফল বুঝতে কারও অসুবিধে না হয়। এরপরও যদি এদেশের বিশেষ করে বাংলার অতি-প্রগতিশীল বা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষদের চোখ না খোলে তাহলে যে সংখ্যালঘুদেরই অমঙ্গল ডেকে আনা হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব মির আফসার আলি। যাঁকে আমরা একডাকে মির নামেই বেশি চিনি। সেই মিরই পবিত্র ইদের দিনে তাঁর বাবাকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তুলনা করে ('আমার বাবা, আমার আল্লাহ্') সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করায় খেপে ওঠে একদল মৌলবাদী। নিজের সম্প্রদায়ের কাছে তীব্র সমালোচিত হওয়ায় স্বভাবতই মুষড়ে পড়েন মির। তাঁর কথায়, আমার মুখ থেকে কী বেরনো উচিত আর কী বেরনো উচিত নয়— তা নিয়ে যাঁরা নির্দেশ দেন, তাঁরা আমার ভাত-কাপড়ের কোনও দায়িত্ব নেননি।

সম্প্রতি মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমে এক খোলামেলা সাক্ষাৎকারে টেলিভিশনের পর্দায় পরিচিত মুখ মির অকপটে বলেছেন, 'আমি ঈশ্বরকে দেখিনি। বাবা কী স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তা দেখেছি। তাই এমন মন্তব্য করেছিলাম। কিন্তু আমায় বলা হলো, 'আপনি ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। আপনি পাপ করেছেন। এখনই নমাজ পড়ুন।' তাঁর আক্ষেপ, 'এই তো অবস্থা!' স্বধর্মের মানুষের এই মৌলবাদী আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত মির।

এখানেই শেষ নয়। কথায় কথায় মির আফসার আলি একটু ফিরে যান পিছনে। সেখানেও ওই একই অবস্থার ছবি! গত বছর বড়দিনের কথা। তিনি সোমা (স্ত্রী) আর মুসকানের (মেয়ে) সঙ্গে একটা ছবি পোস্ট করায় হিংসাত্মক মন্তব্যে ভরে গেল তাঁর ফেসবুকের ওয়াল। বলা হলো, 'আপনি মুসলমান। আপনার উচিত ইদ, বকরি ইদ পালন করা আর রমজানে রোজা রাখা। বড়দিন আপনার উৎসব নয়।'

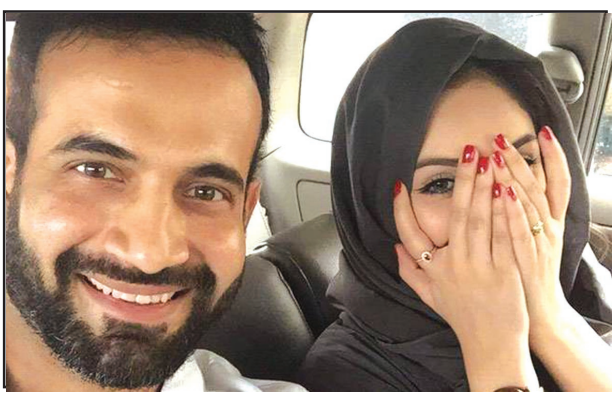

সস্ত্রীক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান।

কোনও রকম রাখঢাক না রেখেই মিরের সাফ কথা, 'আমরা সকলে সাম্প্রদায়িক। আমাদের আঁতে ঘা লাগলেই আমরা তখন আর ইন্ডিয়ান থাকি না।' এরপরই তিনি সোজাসুজি বলেন, 'আমাদের সেক্যুলারিজম শুধু ১৫ আগস্ট আর ২৬ জানুয়ারির জন্য। জানলার কাঁচ নামিয়ে একটা পতাকা কিনে গাড়িতে লাগানোর পর এই দিনই আঠাটা হালকা হয়ে যায়।'

কেন তাঁর এই তিক্ত উপলব্ধি? মির স্পষ্টতই বলেন, 'যখন বুঝি নিজেদের পকেটেড সোসাইটিতে আমাদের একটু আঘাত লাগতে পারে, তখনই বলি, আমাদের ধর্মকে আঘাত করা হচ্ছে। আমাদের দাঁত-নখ-নোংরা চেহারা বেরিয়ে আসে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ধর্ম আর রাজনীতি তেল আর জলের মতো। মিশ খায় না। কিন্তু প্রতিবার কেউ এসে ম্যাজিশিয়ানের মতো দু'টো মিশিয়ে দেয়। আর আমরা সেই 'মিকচার' কড়া ডোজে খাই।'

আরও আছে। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় অনেকেই নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন ১৯ জুলাইয়ের অবাঞ্ছিত সংবাদ শিরোনাম : 'স্ত্রী-মেয়ের ছবি দিয়ে আক্রান্ত শামি-ইরফান।' সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন পোস্ট করেছেন মেয়ের দু'বছরের জন্মদিনের ছবি। আর একজন স্ত্রীর ছবি। তা-ও হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। এতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়! মেয়ে ও স্ত্রী দু'জনেই খুব কাছের মানুষ। দুনিয়া জুড়ে কতো মানুষই তো প্রতিদিন এমন কতো ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। কার কী ক্ষতি?

কিন্তু স্বধর্মের কট্টর মৌলবাদীদের রোষানলে পড়েছেন স্বনামধন্য ক্রিকেটার মহম্মদ শামি ও ইরফান পাঠান। ধারালো সব ইনস্যুইঙ্গার আছড়ে পড়েছে ফেসবুকের দেওয়ালে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শামি-ইরফানের ওই ছবি পোস্ট করা নাকি চরম বিধর্মী কাজ। মৌলবাদীদের খপ্পরে পড়ে তাঁরা রীতিমতো আতঙ্কিত। পরিবারের ওপর মৌলবাদীদের চোরাগোপ্তা হামলার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ওঁদের অপরাধ হলো, ফেসবুকে নিজের মেয়ে ও স্ত্রীর ছবি পোস্ট করা। মেয়ে আইয়ার দু'বছরের জন্মদিন। ১৮ জুলাই সকালে তাই অন্য পাঁচজনের মতোই খুশি মনেই সুদৃশ্য কেক-কাটার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন বাংলার সফল ক্রিকেটার মহম্মদ শামি। মুহূর্তে ২১ হাজারের বেশি 'লাইক'। ৬০০-র বেশি 'কমেন্ট'। যার কয়েকটাতে চোখ বোলাতেই বোঝা গেল শামি ফের আক্রান্ত। কয়েকদিন আগে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সরাসরি বচসায় জড়ানোর পর এবার আক্রমণ ফেসবুকে!

মহম্মদ শামির ফেসবুকে কেরলের কুন্নমকুলমের জনৈক শারুন ইসলামের দোহাই দিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছেন, 'আপনার স্ত্রীকে হিজাব ছাড়া দেখে দুঃখ পাচ্ছি। প্রিয় শামি স্যার কতো ছোটো পাপ করছেন, সেটা বিচার করবেন না। দেখুন কাকে অমান্য করছেন। গো টু হেল।' আবার মণিপুরের এক যুবক নজরুল হক মোইজিং মায়ুমের নির্ভীক মন্তব্য, 'আপনার মেয়েকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পারছি না। কারণ আমি মুসলমান। আর ইসলামে জন্মদিন পালন করা হয় না।'

বলাবাহুল্য, এই-ই প্রথম নয়। এর আগেও একবার গোঁড়া মুসলমানদের এরকম অবাঞ্ছিত আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন শামি। সেবারও হিজাব ছাড়া স্ত্রীর ছবি পোস্ট করে বেশ কিছু ধর্মান্ধ মুসলমানের বিষোদ্গারের মুখে পড়েছিলেন তিনি। মৌলবাদীদের তীব্র সমালোচনার মুখে কিছুমাত্র না দমে মহম্মদ শামি অবশ্য একটি পোস্ট লিখে তাদের একহাত নিয়েছিলেন সেবার। এরপর ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়ায়নি। কিন্তু ধর্মের নামে আবারও সেই একই পথে অবাঞ্ছিত আক্রমণ।

ইরফান পাঠান একটি সেলফি পোস্ট করেছিলেন স্ত্রী সাফা বেগের সঙ্গে। যেখানে দেখা যায় সাফা হাত দিয়ে অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছেন। এই ছবিতেও কিছু ধর্মান্ধ লোক মন্তব্য করতে শুরু করেন। যার সারমর্ম হলো, ইরফানের স্ত্রী কেন হিজাবে মুখ ঢাকেননি। একজনের মন্তব্য, 'মুখ হাতে ঢেকে আছেন এটা ভালো, কিন্তু হাতের পুরোটা কেন ঢাকা নেই?' আর একজন লেখেন, 'ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নেলপালিশ পরা যায় না। ইরফান-পত্নী সাফা কেন নেলপালিশ পরছেন?'

উচ্চ মানবিক দর্শনের ধর্ম ইসলামকে সামনে রেখে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত কাণ্ড করে কিছু মৌলবাদী আসলে ইসলামকে হেয়ই করছে। ইসলামকে হেয় যে করছে, সেকথা বুঝলেও অনেকেই মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে অপারগ। কীসের ভয়? যার ফলে ইসলামকে হেয় করতে দেখেও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারছেন না কেউ। তথাকথিত ইসলামপন্থীদের এ কেমন ইসলাম-প্রেম। যাঁকে ভালোবাসবো, যাঁকে শ্রদ্ধা করবো, তাঁকে অকারণে অবজ্ঞা করতে দেখেও সাচ্চা ইসলামপন্থীরা মুখ বুজে থাকবেন?

উল্লেখ্য, শামি বা ইরফানকে আমরা চিনি ক্রিকেটার হিসেবে। ক্রিকেটে তাঁদের কাজ ও সাফল্যের জন্য। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কী করবেন, সন্তানের জন্মদিনে কী ছবি পোস্ট করবেন কিংবা কী পোশাক পরবেন— সেই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁদের নিজেদের। সেই একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও রকম প্রশ্ন তোলা তো অনধিকার চর্চা, অন্যায় ও অনৈতিক ব্যাপার। ধর্মের নামে এমন কোনও ফতোয়া দেওয়ার অধিকার ওই মৌলবাদীদের কে দিয়েছে? কোন অধিকারে তারা কারও সম্পর্কে এসব প্রশ্ন তোলেন?

তবে এরই পাশাপাশি এটা জেনেও ভালো লাগলো যে, কট্টর মুসলমান মৌলবাদীদের এই অনৈতিক ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন ওই সম্প্রদায়ের কতিপয় পরিচিত মুখ। প্রাক্তন ফুটবলার মইদুল ইসলাম, সিপিএমের সাংসদ মহম্মদ সেলিম এঁদের অন্যতম। তবে আশা ছিল, বাংলার স্বনামধন্য ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে এমন অনৈতিক ধর্মীয় ফতোয়া নিয়ে অন্যান্য মুসলমান বিশিষ্টজনেরাও সমালোচনার ঝড় তুলবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি এখনও।

মানবতা ও মনুষ্যত্বের সামগ্রিক স্বার্থেই যে-কোনও ধর্মের কট্টর মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদে শামিল হওয়া প্রয়োজন। কারণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে-কোনও ধর্মীয় মৌলবাদই সবসময়ে সব ধর্মের মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

এই অনিবার্য বোধে উদ্বুদ্ধ না হলে কোনও দিনও মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যাবে না একথা বলাই বাহুল্য। আর ধর্মীয় মৌলবাদকে কঠোর হাতে রুখে দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তো বটেই, দেশ ও দশেরও ক্ষতি অনিবার্য। ▮

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

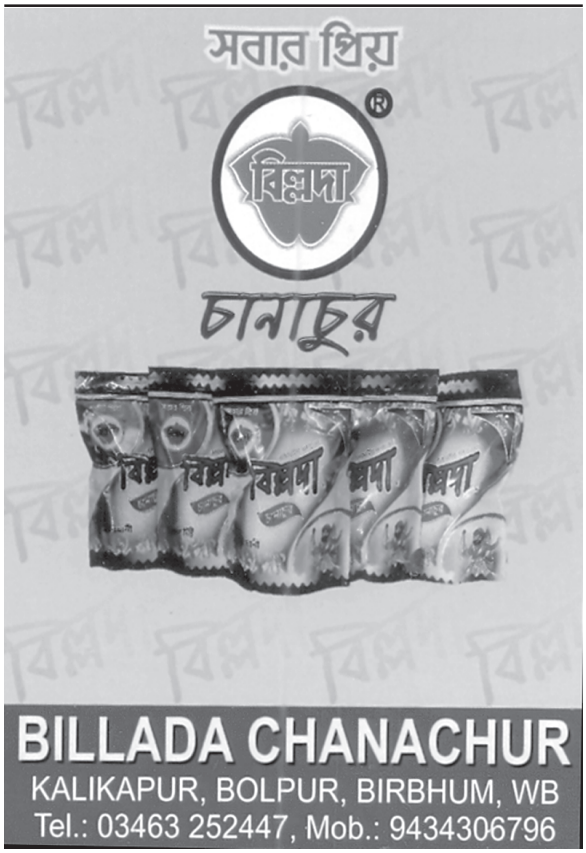

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

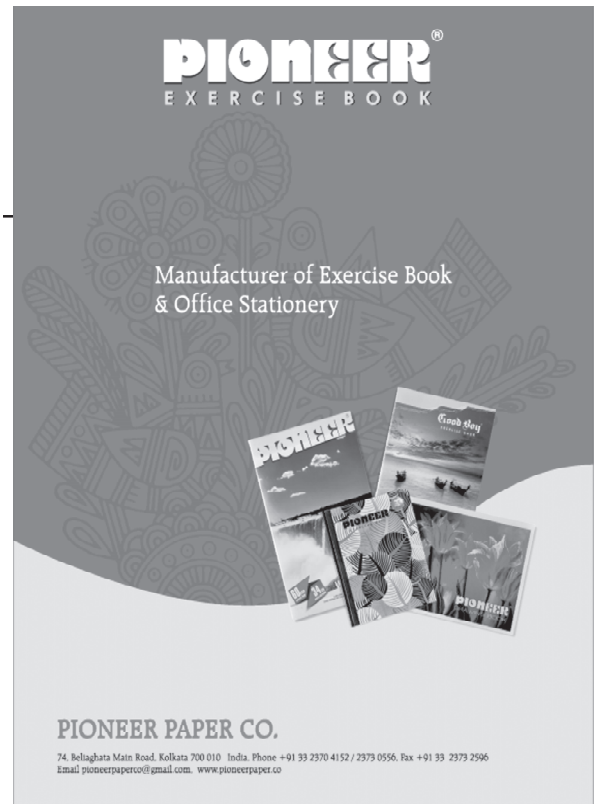

শতবর্ষের আলোয়

বসু বিজ্ঞান মন্দির

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

"যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে পড়"— এই বিখ্যাত কথাটি ঐতিহাসিক রোমা রোঁলাকে বলেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই খুব কাছের এক বন্ধু সম্পর্কে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যদি তুমি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানকে জানতে চাও তবে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে পড় ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে জানো।

যে কয়েক জন মহামানব ভারতমায়ের নাম সমগ্র বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে বিজ্ঞানের এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। এই নক্ষত্রটি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছা ও অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পাঠ সম্পন্ন করে কলকাতায় পাড়ি দেন। এখানে এসে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ১৮৭৫ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন। তারপর ১৮৭৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পড়ার সময়ই পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ফাদার ইউজিন লাফোঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বস্তুত, তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সমান প্রতিভাধর ছিলেন। যার ফলে তিনি ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে ট্রাইপোস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবং ওই বছরই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। আর এখানেই তিনি জীবনের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য ব্যাপক ভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯৮ সালে এই প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে কাজ করার সময় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্রীয় খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়। একবার লর্ড রালি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য সিংহল গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ইংলন্ডে ফিরে যাবার পথে লর্ড রিপনের আহ্বানে কলকাতায় কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময় একদিন বিনা আমন্ত্রণেই তিনি জগদীশচন্দ্রের ল্যাবরেটরি দর্শন করতে আসেন এবং মুগ্ধ হন। ওই দিন বিকালেই কলেজের অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্রকে চার্জশিটের ভাষায় কৈফিয়ত তলব করে, কেন কলেজের অনুমতি ছাড়া লর্ড রালির মতো একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে ল্যাবরেটরিতে তিনি নিয়ে এসেছেন? তাতে জগদীশচন্দ্র খুবই অপমানিত বোধ করেন এবং তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ তার গবেষণার কাজে বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। জগদীশচন্দ্র মনস্থির করেন যে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান শুরু করবেন যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবেন। আর জগদীশচন্দ্র বসুর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের পথে চালিত করেন ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা ২৮ জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে পরাধীন ভারতে পদার্পণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিবেদিতা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ফলে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সাফল্যের সূত্র ধরে বিশ্ব বিজ্ঞানের দরবারে নব প্রতিষ্ঠিত এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে নিবেদিতা

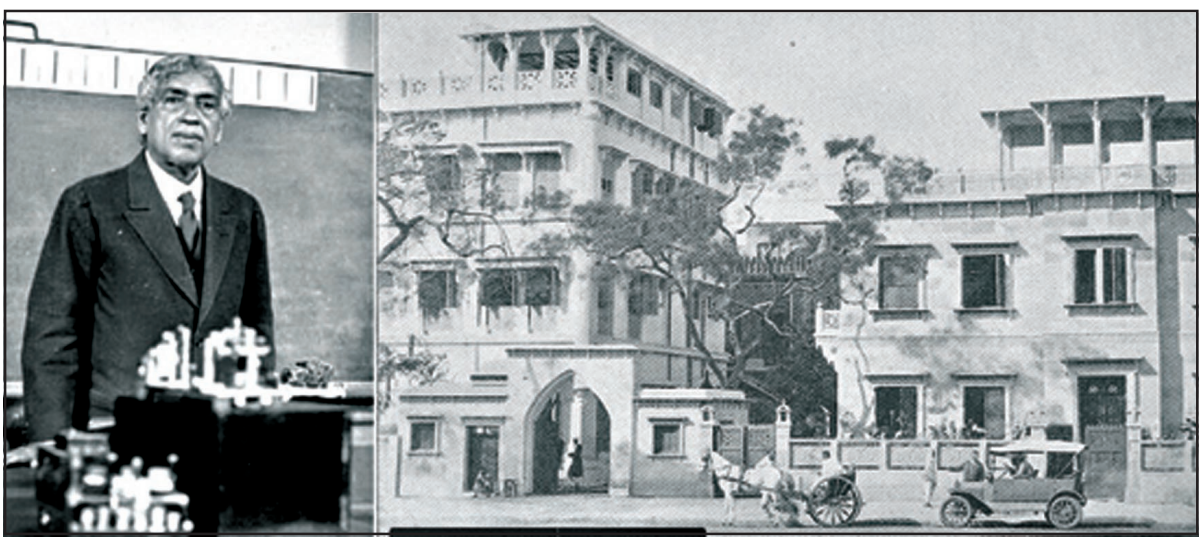

ফঃ ৩

জগদীশচন্দ্রকে আদর করে 'ব্রায়ান' বলে ডাকতেন। স্কটিশ শব্দ ব্রায়ানের বাংলা অর্থ হলো 'খোকা'। এতেই বোঝা যায় নিবেদিতা আজীবন জগদীশচন্দ্রকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন।

একবার ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে তার মাইক্রোওয়েভের কাজের উপর একটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সেই সময় এই রকম একটি গবেষণাগার ভারতে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সে সময় এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সি থেকে অবসর নেবার পরই জগদীশচন্দ্র আগের পরিকল্পনা সফল করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ১৯১৭ সালে তা পূরণ করেন।

সেই সঙ্গে পূরণ হয় ভগিনী নিবেদিতার স্বপ্ন। তিনি হয়তো দেখে যেতে পারেননি কিন্তু তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করেছেন এক সম্পূর্ণ ভারতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। এমনকী আচার্যের নিজের ব্যক্তিগত গবেষণার কাজেও তিনি উৎসাহ দিতেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিবরণ যাতে হারিয়ে না যায়, যাতে তা ভাবীকালের বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছায় সে জন্য তিনি বলেছিলেন, ''আমার কলম তোমার চিন্তাকে ভৃত্যের মতো অনুসরণ করবে''। নিবেদিতা জীবিত থাকাকালীন জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিবরণ নিজে লিপিবদ্ধ করে দিতেন।

একবার ১৯০৯ সালে জগদীশচন্দ্র, নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত মহান ত্যাগের প্রতীক বজ্র দেখেন। সেই বজ্রকে তিনি স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার মাঝখানে স্থাপিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও তাঁর স্বপ্ন তদানীন্তন ভারতীয় রাজনেতাদের কারণে সফল হয়নি। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের মর্যাদা রেখেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণের এই বিশাল পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অনেক অর্থের। সরকারি সহযোগিতা ব্যতিরেকেই তিনি তা জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালে নিবেদিতা বিশিষ্টা ইউরোপীয় মহিলা মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অগ্রগতির কথা শুনে মিসেস বুল খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এর ফলে তাদের মধ্যে এক অত্যন্ত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একবার ১৯০০ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মিসেস বুল সেই সময় জগদীশচন্দ্রকে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। আর সেই থেকে জগদীশচন্দ্র বুলকে মায়ের বিকল্প হিসাবে দেখতেন। মিসেস বুল মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে উইলে (ইচ্ছাপত্রে) অনেক অর্থ জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য দান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জগদীশচন্দ্রের অন্যতম মিত্র। তিনিও অনেক অর্থ সংগ্রহ করে জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। এই অর্থ সংগ্রহ কার্যে যার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে তিনি হলেন শ্রীমতী অবলা বসু। তিনি তাঁর নিজের যা কিছু সম্পদ ছিল (প্রায় চার লক্ষ টাকা) তা এই মহৎ কাজে অঞ্জলি দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি কঠোর মিতব্যয়িতার সঙ্গে সংসার চালিয়ে অর্থ সঞ্চয় করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সর্বগুণসম্পন্না সাধ্বী গৃহিণী বলে উল্লেখ করেছিলেন।

৯৩/১ আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এই বিজ্ঞান বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বাড়ি তৈরি শুরু হয়। অবশেষে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের ৬০ তম জন্মদিনে তার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্থক হয় এই বোস ইনস্টিটিউশনের দ্বারোদঘাটনের মধ্য দিয়ে। জগদীশচন্দ্র এই দ্বারোদ্ঘাটনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি গান রচনা করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় রবীন্দ্রনাথ দেশের বাইরে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি চিঠিতে উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলেন ''...তোমার বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে যদি আমি থাকতে পারতুম তাহলে আমার খুব আনন্দ হতো। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তাহলে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল।'' রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের আশা পূরণ করেছিলেন। তিনি বিদেশ থেকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্যে রচনা করে পাঠিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত 'আবাহন'।

'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন ''এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র বীক্ষণাগার নহে, এটি একটি মন্দিরও। স্থূলভাবে আমরা জানি যে চেতনার দ্বারা বিজ্ঞান সত্যতে আরোহণের চেষ্টা করে এবং যন্ত্রপাতি সেই চেতনাশক্তিকে বিস্তৃত করে। এমন কিছু সত্য আছে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গণ্ডির বাইরে থাকে, সেই সত্যকে বিশ্বাসের দ্বারা অর্জন করতে হয়। তাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, কারণ একমাত্র মন্দিরই সেই বিশ্বাস প্রভাবিত সত্যকে বোঝবার উপযুক্ত জায়গা।'' সেই কারণেই বীক্ষণাগারের নাম রেখেছিলেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। সেই সঙ্গে নিজেই একটি হস্ত লিখিত নিবেদন পত্রের দ্বারা এই বিজ্ঞান মন্দিরকে জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন।

নিবেদিতার কল্পিত সেই বজ্রচিহ্নকে জগদীশচন্দ্র তার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্থান দিয়েছিলেন। যা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে আজও মন্দিরের শোভা বর্ধন করে চলেছে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকতেই মূল গেটের উপরে যে পতাকা রয়েছে সেই পতাকার মধ্যে অবস্থান করছে শ্বাশত ভারতবর্ষের চিরন্তন ত্যাগের প্রতীক। এবং গেটের কার্ণিশের উপরে রয়েছে সম্রাট অশোকের আত্মত্যাগের চিহ্ন বহনকারী আমলকী গাছ। নিবেদিতা এই বিজ্ঞান মন্দিরকে দেখে যেতে পারেননি। তাই নিবেদিতার ইচ্ছাকে স্মরণে রেখেই মন্দিরের শীর্ষে বজ্রকে স্থাপন করা হয়েছে। এরপরই মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণে রয়েছে লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল গাছ। যা জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদবিদ্যায় গবেষণার প্রেরণার উৎস। মূল গেট দিয়ে প্রবেশের পরই বাঁ দিকে ছোট্ট একটি পাথরের পদ্মাকৃতি জলাশয়। সেই জলাশয়ের পাশেই রয়েছে LADY WITH THE LAMP-এর রিলিফ মূর্তি যা নিবেদিতার প্রতিরূপ বলে কথিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতী ছাত্র কৃষিবিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের তথ্য থেকে জানা যায় যে ওই জলাশয়ের নীচেই নিবেদিতার চিতাভস্ম রাখা আছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকতে প্রথমে পড়ে মিউজিয়াম। সেই মিউজিয়ামের এন্ট্রাস হলের গেটে আছে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাঠের দরজা। মিউজিয়ামের ভিতরে ঢুকতেই যার দিকে দৃষ্টি পড়ে সেটি হলো ডি পি রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি। আর মূল ক্যাম্পাস-প্রাঙ্গণে রয়েছে আচার্যদেবের স্মৃতি মন্দির।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভবনটি ধূসর রক্তবর্ণ বেলে পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ভবনটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সমগ্র ভবনটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজন্তা ইলোরার কারুকার্য ও হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন। যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে বসু বিজ্ঞান মন্দির শুধু বিজ্ঞান সাধনার কেন্দ্র নয়, এটি একটি জাতীয়তার প্রতীক।

এই বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশপথের ডান দিকে রয়েছে জগদীশচন্দ্রের অতি প্রিয় ১৫০০ আসন বিশিষ্ট বক্তৃতা কক্ষ। শিল্পী নন্দলাল বসু এই হলের ভিতরে ও বাইরের প্রধান দরজার চিত্রগুলি পরিকল্পনা করেছেন। বক্তৃতা হলের মঞ্চের নীচে নন্দলাল বসু নির্মিত সপ্তাশ্বযোজিত রথ খচিত তাম্রফলক রয়েছে। আর কক্ষের উপরে রয়েছে ওঁরই পরিকল্পিত বিখ্যাত দেওয়াল চিত্র (ফ্রেস্কো)।

এই বিজ্ঞান মন্দিরকে সচল রাখার জন্য জগদীশচন্দ্র এক অভিনব পদ্ধতি নিয়েছিলেন। তিনি এই ভারতীয় বীক্ষণাগারের জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন রেখেছিলেন। আর সেই আবেদনে সকল দেশবাসীর সহযোগিতা ছিল অকল্পনীয়। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী ২ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ, বরোদার মহারাজ, কাশ্মীরের মহারাজ, মহারাজা গায়কোয়ার্ড, শেঠ মুলরাজ, শ্রী বামেনজী প্রমুখেরা অনেক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তিনি যেসব জায়গায় বক্তৃতা দিতে যেতেন সেখানে টিকিটের ব্যবস্থা করা হতো। আর এভাবেই বিভিন্ন সভা থেকে তিনি ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই সকলের সহযোগিতায় তিনি ১১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। যখন জনসাধারণের অর্থে বিজ্ঞান মন্দিরে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে গবেষণার কাজ চলতে লাগল তখন ব্রিটিশ সরকার (চক্ষু লজ্জার খাতিরে) বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। জীবিতকালে তিনি ১২ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে যান। তার মৃত্যুর পর তার সহধর্মিণী শ্রীমতী অবলা বসু তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তির সাহায্যে আরো একটি লক্ষাধিক টাকার ফান্ড তৈরি করে যান।

জগদীশচন্দ্রের উত্তরকালে দেবেন্দ্রমোহন বসুর কাঁধে আসে এই বিজ্ঞান মন্দিরের গুরু দায়িত্ব আর বর্তমানে সিদ্ধার্থ রায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বর্তমানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আকাডেমিক ডিপার্টমেন্ট সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। বাগবাজার, কাঁকুড়গাছি, ফলতা, মধ্যমগ্রাম, দার্জিলিং এবং সর্বশেষে সল্টলেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রসার ঘটেছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে গবেষণার সুযোগ। আগে ৬টি বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল— Biochemistry, Bioinformatics, Biophysics, Chemistry, ENUS, Microbiology। বর্তমানে অধ্যাপনার জন্য আরো তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— Molecular Medicine, Physics, Division of plants biology. ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার উন্মেষ ঘটিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির আজও স্বমহিমায় বিরাজিত। প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মেটাতে স্বল্পবৃষ্টি জেলাগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও সেই জল কীভাবে পরিস্রুত করে ব্যবহার করা যায় তার জন্য আরোও উন্নত গবেষণা এবং গ্রামেগঞ্জে তার প্রসার ও প্রচারের কাজ করে চলেছে এই বসু বিজ্ঞান মন্দির। পশ্চিমবঙ্গে ৫টি জেলার প্রায় ৪০টি গ্রামে চলেছে রুরাল প্রজেক্টের কাজ এবং প্রতিটি গ্রামই এই কাজের সাফল্যে সুফল পাচ্ছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরই প্রথম মাইক্রোবায়োলজির ডিপার্টমেন্ট শুরু করেছে। অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ রায় জানান মাইক্রোবায়োলজিতে যে গবেষণা চলছে তা সফল হলে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এক নূতন দিগন্ত খুলে যাবে।

এই বসু বিজ্ঞান মন্দির জগদীশচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের এক চিরস্থায়ী প্রমাণ। তার দেশভক্তির জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই বীক্ষণাগার। এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন সমিতিতে তিনি শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই রেখেছিলেন, কোনো বিদেশি শ্বেতাঙ্গকে রাখেননি। এর পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার কোনোদিন নাক গলাতে পারবে না, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি জাতীয় সম্পদ ও জাতির কল্যাণেই এটি ব্যবহৃত হবে। ১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নবম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, ''যাহারা এই গবেষণা কার্যে সম্পূর্ণ জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল ও দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া কর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী যে-কোনো কার্যেই অগ্রণী হতে অক্ষম— এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য এই তথাকথিত কলঙ্ককালিমা ঘুচাইতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলাম।''

জগদীশচন্দ্র যেসব যন্ত্রের আবিষ্কার করতেন সেসব যন্ত্রের নামকরণ বাংলায় বা সংস্কৃতে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ক্রোস্কোগ্রাফের নাম 'বৃদ্ধিমান' রাখার কথা ভেবেছিলেন। অন্য একটি যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'কুঞ্চনমান'। কিন্তু সেটা ইংরেজদদের কাছে কাঞ্চনম্যানে পরিণত হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে হিরণ্যকশিপুকে দিয়ে বরং হরিনাম করানো যেতে পারে কিন্তু ইংরেজকে দিয়ে বাংলা বা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। যুবক অবস্থাতেই জগদীশচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ দেখে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় বিজ্ঞানকে উৎকর্ষতা লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে বিশ্ববিজ্ঞানের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য অফুরন্ত শক্তি ও রসদ জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এলে ওই দিকটি অবহেলিত হবে। তাই তীব্র জাতীয়তাবোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যাননি।

১০০ বছর ধরে এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অবদান ও সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত। ১৯৭৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন ৪ জন। এখনও পর্যন্ত এখান থেকে ৩৩ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন আকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন, এর মধ্যে একজন বিজ্ঞানী *academy of science for the developing country*-র ফেলো। আর এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পূজারি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তিনি এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রসার দেখে যেতে পারেননি (মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭)। কিন্তু বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সর্বত্র তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়াজ আজও আমরা শুনতে পাই।

বসু বিজ্ঞান মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান

নির্মল মাইতি

নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি ভারতে পদার্পণ করেন। ২৫ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। মার্গারেট নোবল থেকে তিনি হলেন ভারতবর্ষের জন্য উৎসর্গীকৃতা— নিবেদিতা। ১৮৯৮ সালের শেষ দিকে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন। নিবেদিতা হওয়ার আগে মিস মার্গারেট নোবল বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অভিজাত সেসেমি ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ওই সংস্থার মাধ্যমেই বারনার্ড শ, হাক্সলি প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা, হিরাম ম্যাক্সিম, টমসন, হেল্মহোলজ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর বিজ্ঞানে অনুরাগ মূলত দুটি কারণে— ১. বিজ্ঞানের দ্বারা জাগতিক উন্নতি সাধন এবং ভারতের দারিদ্র্য মোচন এবং ২. ধর্ম দর্শনের সত্য বিজ্ঞান দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞান খিদে মেটাতে পারে আর ধর্ম মানুষকে আত্যন্তিক মুক্তি দিতে পারে। স্বামীজী সুন্দর বলেছেন— Science informs, religion transforms. বৈজ্ঞানিক টেসলা গণিতের মাধ্যমে অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। আর অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল স্বামীজীর মিশন। বলা বাহুল্য ভগিনী নিবেদিতাও ছিলেন সেই পথের পথিক। নিবেদিতাও বিজ্ঞানের তীব্র অনুরাগী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের ও ইংরেজ সরকারের নানান বাধা কাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। বশীশ্বর সেনকে বিজ্ঞানে অভিষিক্ত করেন। বেঙ্গালুরুতে Indian Institute of Science (IIsc) স্থাপনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

জগদীশচন্দ্র ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সিতে ২৪ বর্গ ফুটের এক পরিত্যক্ত ঘরে এক স্বল্পশিক্ষিত কারিগরকে নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। তিনি বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপাদন

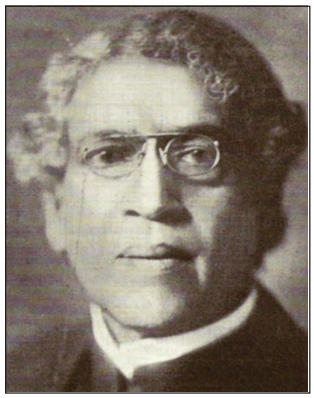

জগদীশচন্দ্র বসু

ভগিনী নিবেদিতা

করলেন, যা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘর থেকে মাঝের একটি ঘরের ব্যবধানে পেডলারের ঘরে একটি পিস্তল ফায়ার করল। পরে, ১৮৯৫ সালে বাংলার গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে টাউন হলে এই পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। এটিই মাইক্রোওয়েভ যা মোবাইল, রাডার, টেলিগ্রাফি ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৯৬ সালে শিক্ষক লর্ড র‍্যালির নিমন্ত্রণে তিনি লন্ডনে রয়্যাল সোসাইটিতে বিদ্যুৎতরঙ্গ সংক্রান্ত এই পরীক্ষা প্রদর্শন করে আলোড়ন ফেলে দেন। ওখানে শিল্পপতিরা তাঁকে পেটেন্ট নেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নেননি। কারণ তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য। যাইহোক তাঁর লেকচার নোট চুরি হয়ে যায়। পরে মার্কনি বেতার আবিষ্কারের কৃতিত্ব পান। ইংরেজরা এই ধারণা পোষণ করত যে, ভারতীয়রা কল্পনাপ্রবণ, তারা বিজ্ঞান সাধনার অনুপযুক্ত। এটি জগদীশচন্দ্রের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। নিবেদিতাও সোৎসাহে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০০ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে Similarity in response in living and nonliving matter— জীব ও জড়ের সদৃশ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর লন্ডনে আসেন। জীব ও জড়ের সদৃশ অনুভূতির আবিষ্কার পদার্থবিদরা মেনে নিলেও জীববিজ্ঞানীরা মানলেন না।

এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং

তাঁর অস্ত্রোপচার করতে হয়। পরে সুস্থ হয়ে লর্ড র‍্যালির ব্যবস্থায় রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে ডেভিড পরীক্ষাগারে কঠোর গবেষণার কাজ করলেন যাতে অকাট্যভাবে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ১৯০১ সালের ১০ মে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে এক টুকরো টিন এবং ব্যাঙ-এর পেশির ওপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে দেখালেন, তাদের প্রতিক্রিয়া একই রকম কিন্তু প্রধান শরীরতত্ত্ববিদ জন স্যান্ডার্সন এবং ওয়েলার তা মানলেন না। তাঁর পেপারটিও রয়্যাল সোসাইটি প্রকাশ করল না। শরীরতত্ত্ববিদরা পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন নিজেকে পদার্থবিদ্যার মধ্যেই সীমিত রাখেন। প্রাচ্য ভাবালুতার কথা উঠল। জগদীশচন্দ্র লিখলেন— ‘‘সকলেই জানে, আমাদের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের নিখুঁত বিচারের শক্তি আছে, অধ্যবসায়ও আছে।’’ নিবেদিতা এই সময়ের চিত্র দিয়েছেন— ‘‘এই ভয় যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে যে, তিনি যদি কোথাও এতটুকু অসফল হন, তাহলে তাঁর স্বজাতীয়রা শিক্ষালাভের অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন না।’’ তিনি লন্ডনে আরও গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু বিরোধী শরীরতত্ত্ববিদদের তদ্বিরে ভারত সচিব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা চেয়েছিলেন— তিনি যেন সরকারি চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন। ত্রিপুরা মহারাজ তাঁকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এমতাবস্থায় ভারত সচিব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক ভাইনসের আমন্ত্রণে তিনি ১৯০২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি লিনিয়ান সোসাইটিতে পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। সেখানে তাঁর পেপারও প্রকাশ হলো— এমন সময় ওয়েলার জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে নিজের রচনা বলে ভুয়ো আপত্তি তুললেন। তদন্ত হলো এবং প্রমাণিত হলো যে, জগদীশচন্দ্র পূর্বে রয়্যাল সোসাইটিতে যে প্রদর্শন করেছিলেন, সেই তত্ত্বই ওয়েলার চুরি করেছিলেন। লিনিয়ান সোসাইটিতে তাঁর পত্র প্রকাশিত হলো। তারপর রয়্যাল সোসাইটিতেও তাঁর পেপার প্রকাশিত হয়।

যে ব্রিটিশরা প্রাচ্য ভাবালুতাকে বিজ্ঞানের অন্তরায় ভাবত, তারাই একে বিজ্ঞানের

গবেষণার অনুকূল ভাবতে বাধ্য হলো। The Spectator পত্রিকা লিখল যে, ভারতীয় ধ্যানপ্রবণ মন বহির্জগতের আকর্ষণ তুচ্ছ করে যখন বিজ্ঞানে নিয়োজিত হয়, তখন ইউরোপীয়দের অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করতে পারে। ‘‘The people of the East have the burning imagination...; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself; and a power of persistence–it is something a little different from patience–such as hardly belongs to any European. ...Nothing would seem laborious to him (Dr. Bose) in his enquiry, nothing insignificant, nothing painful, and more than it would seem to the true Sannyasi in the pursuit of his enquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within the sphere of enquiry of a thousand men with the Sanyasi mind...’’ জগদীশচন্দ্র ওলি বুলকে একটি সংবাদপত্রের অংশ কেটে পাঠিয়েছেন, যাতে সুন্দর মন্তব্য করা হয়েছে— ‘‘In each case the electrical emotion, as recorded by galvanometer was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.’’ আমরা দেখছি, জগদীশচন্দ্র এই সময় প্রবল বাধা ও অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন— ১. শরীরতত্ত্ববিদদের বিরোধিতা, ২. তাঁর শারীরিক অসুবিধা ও ৩. ভারত সরকারের বিরোধিতা। এগুলি সমাধানের জন্য নিবেদিতা কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। নিবেদিতা একে ‘বসু সমর’ বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর পেপার যখন প্রকাশ হল না, তখন সিদ্ধান্ত হল যে, গবেষণা বই আকারে প্রকাশ করা হবে। নিবেদিতা সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বইয়ের ডিজাইন, নকশা, চিত্রণ, প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ— সব নিজেই করলেন। ১৯০২ সালে প্রথম বই Re-

sponse in the Living and Nonliving, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০, নক্সা ১৯৯ ও ছবি সংখ্যা ১১৭; দ্বিতীয় বই— Plant Response (1906) ; তৃতীয় বই— Comparative Electro Physiology (1907)। নিবেদিতা এই বইগুলিকে ''আমাদের বই'' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সব কাজে তাঁর ব্যস্ততা বুঝতে পারি তাঁর চিঠি থেকে। ১৫ নভেম্বর, ১৯০০ নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখছেন— ''এই সপ্তাহের প্রতিদিনই তোমাকে লেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু টাটা স্কীম ও ডঃ বসুর পেপারগুলির উপর এত বেশি সময় গেছে যে আমি লিখে উঠতে পারিনি।'' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন— জগদীশচন্দ্র প্রায় বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাসভবনে আসতেন। এখানে বই লেখার কারণে অধিক রাত অবধি থাকতে হোত। রাতের খাবার অনেক সময় এখানেই খেয়ে নিতেন। এছাড়া জগদীশচন্দ্রের অনেক পেপার যা রয়্যাল সোসাইটিতে Philosophical Transaction জার্নালে বের হোত, সেসব নিবেদিতা লিখে দিতেন। জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতার জন্য সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করে দিয়েছেন, যা দশ খণ্ডে বাঁধানো হয়েছে। উল্লেখ্য মহাভারত জগদীশচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। ১৯০৭ সালে নিবেদিতার Cradle Tales of Hinduism প্রকাশিত হয়। আবার জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প অনুবাদ করে দিয়েছেন।

১৮৯৩ সালে Empress of India জাহাজে ওকহোমা থেকে ভ্যাঙ্কুবার এবং সেখান থেকে ট্রেনে শিকাগো গমনকালে জামশেদজী টাটা স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন। স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় ১৮৯৮ সালে টাটা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য মোটা টাকা দান দিতে চাইলেন। এই সুযোগটা নিবেদিতা কাজে লাগাতে চাইলেন। যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে জগদীশচন্দ্র স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন, এই উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে নভেম্বর মাসে ওলি বুলকে দিয়ে ইংলন্ডে এক ভোজসভায় বিভাগীয় বড় কর্তা জর্জ বার্ড উডকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বার্ডউড রাজি হননি। গোখেল মাডারেট পন্থী রাজনীতিক ছিলেন, গভর্নমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ২৭ মার্চ, ১৯০৭ পত্রে নিবেদিতা তাঁকে লিখলেন, ইংলন্ডের বৈজ্ঞানিকরা জগদীশচন্দ্রের জন্য যে গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, তিনি যেন সরকারকে সে বিষয়ে অনুরোধ করেন।

সরকারি চাকরি ছেড়ে জগদীশচন্দ্র যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে লেখেন। ম্যাকলাউডকে ১৯০১ সালে ১৯ জুলাইয়ের চিঠি --- ''ওঁকে (জগদীশচন্দ্রকে) না বলে আমি মিঃ টেগরের কাছে লিখেছি— কোনো হিন্দু রাজা কি এঁর কাজের ভার নিতে পারেন না?'' নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় রমেশ চন্দ্র দত্তও রবীন্দ্রনাথকে লেখেন। রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরা মহারাজকে লেখেন এবং ত্রিপুরা মহারাজ জগদীশচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করেন। অর্থ সাহায্য এবং বন্ধু সংগ্রহের ব্যাপারে নিবেদিতা বিশেষ উদ্যোগ নেন। নিবেদিতা ওলি বুলকে প্রেরণা দেন জগদীশচন্দ্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে। (২৬.৩.১৮৯৯ বুলকে পত্র)। যদিও বুল স্বামীজীর কাছে ধীরামাতা ছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বকে পুত্ররূপে আপন করে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার তাঁর কন্যা ওলিয়াও মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না। যা হোক, আমরা দেখি পরবর্তীকালে ওলি বুল ও জগদীশচন্দ্র মাতা পুত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ। বুল জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতার সময় আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে আসেন এবং অপারেশনের সার্জন ঠিক করা, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করেন। ১৯০৭ সালে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে তিনি বুলের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক এরূপ নিবিড় ছিল যে, বুলের মৃত্যুর পরও ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র আমেরিকায় তাঁর ভাই মিঃ থর্পের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

অপারেশনের পর নিবেদিতার উইম্বলডনের বাড়িতে জগদীশচন্দ্র বিশ্রাম করেছিলেন। পালা করে নিবেদিতা ও অবলা বসু অক্লান্ত সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। বুলকে লেখা ২৯.১১.১৯০০ তারিখের একটি চিঠিতে নিবেদিতা, বুল, জগদীশচন্দ্র ও তাঁর মধ্যে ত্রিভুজ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন— ''ড. বসু জানালেন— আমি তোমার উপর উৎপীড়ন করি, তুমি কর তাঁর উপর, কারণ তিনি তোমার কোনো অভিপ্রায় রোধ করতে সমর্থ নন, এবং অপরদিকে তিনি করেন আমার উপর।'' বুল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অনেক অর্থ দান করেন। জগদীশচন্দ্র প্রথমে বুলের মৃত্যু দিবস ১৮ জানুয়ারিতে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

প্রথম সাক্ষাতের সময়কালে জগদীশচন্দ্র তাঁর ব্রাহ্ম সংস্কার নিমিত্ত নিবেদিতার গুরুপূজা, কালী বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিবেকানন্দ একজন মানুষকে দেবতা করে দিয়েছেন— এজন্য তাঁর প্রতিও বিরূপ ছিলেন। কিন্তু যা হোক, নিবেদিতার প্রচেষ্টায় বসু দম্পতি বেলুড়ে এসেছেন, স্বামীজীও বসু বাড়িতে এসেছেন এবং অবলা বসুর পূর্ববঙ্গীয় রান্না খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। ৫.৮.১৯০৯ নিবেদিতার পত্রে পাচ্ছি— অবলা বসু আগেরদিন মায়ের দর্শন করেছেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে লেগেট ভবনে স্বামীজী, ওলিবুল, ম্যাকলাউড, প্যাট্রিক গেডিস, নিবেদিতা ও বসু দম্পতি মিলিত হতেন। গেডিস প্যারিস প্রদর্শনীতে International Association-এর বৈঠক সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই পরে জগদীশচন্দ্রের জীবনী লেখেন। স্বামীজী প্যারিসে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় নিবেদিতার আগ্রহের বিশেষ কারণ হলো— এই গবেষণা তাঁর প্রিয় জীবন দর্শন অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে। স্বামীজী তো এই ভারতীয় দর্শনকেই সারা বিশ্বে তুলে ধরতে চেয়েছেন— এটিই ছিল তাঁর মিশন। জগদীশচন্দ্রও তা উপলব্ধি করেছেন। ২৫.১২.১৯০০ তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠিতে নিবেদিতা জানাচ্ছেন— ''তিনি খুব সহজ ভাবে বললেন, এসব কাজ কার জন্য তা জানি এবং সেই 'কে' হলেন আমার পিতা (স্বামীজী)।'' ৬ ডিসেম্বর, ১৯০৫-এ ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন— 'যখন তাঁকে (স্বামীজীকে) 'একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম, শুনেছিলাম যে সর্বপ্রকার জ্ঞান তারই অন্তর্লীন, তখন নিজের মনে বলেছিলাম, ''বেশ কথা, তবে এই তত্ত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে; তত্ত্বকে এখনকার মতো

কাজ চালাবার জন্য মেনে নিলাম!" আর এখন পাঁচ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহায়ে ওই তত্ত্বের পরীক্ষা করে, তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি!"

জগদীশচন্দ্রও সুস্পষ্টভাবে তাঁর পেপারে অদ্বৈত তত্ত্ব বিবৃত করেছেন। রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে বক্তৃতায় 'জড় ও জীবের উত্তেজনায় সাড়া' বক্তৃতার উপসংহারে করেছেন— "It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things–the mote that thrills on ripples of light, the teeming light on earth and the radiant Sun that shine on it–it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago–"They who behold the One, in all the changing manifold of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else." প্রথম বই 'Response in the Living and Nonliving'-এর উৎসর্গ পত্রে ঋগ্বেদের বাণী উদ্ধৃত ছিল— The real is One, Wiseman call it variously–Rig-Veda. Review of the reviews পত্রিকায় নিবেদিতা নিজে বইটির আলোচনা করেছেন— "Dr. Bose's discovery is in some special sense the contribution of his whole race." দেখা যাচ্ছে— জদীশচন্দ্রর বিজ্ঞান সাধনা ভারতের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে সমার্থক। ১৮.৪.১৯০৩ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতে বলছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কর্তব্য অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা ''ভারতের যে বিরাট মন উপনিষদের যুগে সকল মানব জ্ঞানকে পরিক্রমণ করে তাকে অদ্বৈত বলে ঘোষণা করেছিল, সেই মনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিরাট বস্তুপুঞ্জকে সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করেছে। তাকে পুনশ্চ দর্শন করে নিছক অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী যন্ত্র-উপাসক, লোভী পাশ্চাত্যের কাছে পুনরায় ঘোষণা করবে— বহুরূপে এই বস্তু সত্যের মূলে সেই এক-অদ্বৈত।"

মায়াবতীতে বক্তৃতায় এই অদ্বৈতের স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন— প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় জুলাই ১৯১৩ সংখ্যায় তার কিয়দংশ— He also suggested how scientific discoveries proved, more and more as they are extended, the underlying unity of life, despite the multiplicity of living forms and showed how science was in real consonance with the teachings of the Hindu philosophers that. "From a multi verse we proceed to a universe."

জগদীশচন্দ্র সচেতনভাবেই Response কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। বিরোধী শরীর বিজ্ঞানীদের এতে আপত্তি ছিল— তারা Reaction বলতে চেয়েছিলেন। আমরা চেতন পদার্থের ক্ষেত্রেই Response কথাটি ব্যবহার করি। জগদীশচন্দ্র তা মেনে নেননি। স্পষ্টত, অদ্বৈত ভাবনাই তাঁর মতকে দৃঢ় ও অনড় করেছে।

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণা প্রচারে ব্রতী হলেন। তিনি ১৯০২ সালে মাদ্রাজ মহাজন সভায়, কলকাতা ক্লাসিক থিয়েটারে ('বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বক্তৃতা) এবং মুম্বইয়ে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার উপর ভাষণ দিলেন। নিবেদিতাই ইংলন্ডের রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার সবিশেষ বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তার ভিত্তিতে এবং স্থানে স্থানে হুবহু অনুবাদ করে ''আচার্য জগদীশের জয়বার্তা'' নামে প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন— ''আমাদের দেশ দর্শনে যে পথে গিয়েছিল, ইউরোপে বিজ্ঞানও সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ...আচার্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তিনি বিজ্ঞান রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদের পথ— তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্মে, সেই পথ ব্যতীত, 'নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।"

দেখছি নিবেদিতা 'বসু সমরে' প্রবল ভাবে অবতীর্ণ হয়ে জগদীশচন্দ্রকে রক্ষা করেছেন, পক্ষীমাতা যেমন পক্ষীশাবককে তার ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন— ''এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় রূপে তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হলো বিশ্বভূমিকায়।।" জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতার এই ভূমিকা অনুভব করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছেন নিবেদিতা সম্বন্ধে লেখার জন্য। ফলে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য রচনা— 'ভগিনী নিবেদিতা'।

স্বামীজী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করেন— ''তুমি ভারতের সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা হও।" সে আশীর্বাদ নিবেদিতা তাঁর জীবনে মূর্ত করেছিলেন— তাঁর স্বীকৃতি পাই রবীন্দ্র রচনায় 'লোকমাতা' সম্বোধনে। ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার এক চিঠিতে (২৫.১২.১৯০০) তাঁর মাতৃহৃদয়ের আকুতির পরিচয় পাই— ''এই ক্রিসমাসে আমি প্রথম 'লাবণ্য ও কারুণ্য প্রতিমা' মেরীর পূজারী হয়েছি। ...আহা, মেরী! যে মাতৃত্ব পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর মধ্যে, তার কণামাত্র যেন অন্যে পায়।" এই বর্ণনা পড়লে অলক্ষ্যে মেরির স্থলে নিবেদিতার মূর্তি চলে আসে। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের থেকে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে খোকা বা Birn বলে চিঠিপত্রে সম্বোধন করেছেন। আর অবলা বসুকে 'বো' বলতেন। তাঁর মাতৃহৃদয়েই এটা সম্ভব করেছিল। ২৬ এপ্রিল, ১৮৯৯ মিসেস সারাবুলকে চিঠিতে লিখছেন— ''আর কোনো বন্ধুত্ব থেকে আমি দুটি জিনিসের এহেন উপলব্ধি পাইনি— এক, আমার মাতৃত্বের অনুভব ইত্যাদি যা তুমি বুঝবে..." মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অবলা বসু তাঁর মাতৃত্বের সুন্দর একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। একটি বোকাটে ব্রিটিশ ছেলেকে বাধ্য করতে না পেরে তার বাবা মা তাকে জাহাজে ভারতে পাঠিয়ে দিল। সেই জাহাজে নিবেদিতাও ছিলেন। জাহাজে ছেলেটির উৎপাতে সবাই বিরক্ত। কিন্তু নিবেদিতা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করলেন এবং তাকে তাঁর প্রিয় একটি সোনার দামী ঘড়ি উপহার দিলেন। পর বৎসর নিবেদিতা তার মার কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী পত্র পান— ছেলেটি পূর্ব আফ্রিকায় মৃত্যুশয্যায় নিবেদিতাকে স্মরণ করেছিল এবং সে নিজেকে সংশোধন করেছিল।

১৯০৪, ১৯০৭ এবং ১৯১১ সালে নিবেদিতা বসু দম্পতিকে নিয়ে মায়াবতী গেছেন। বুদ্ধগয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। সেখানে বজ্রচিহ্নের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাই দিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র এই বজ্রচিহ্নকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতীক করেছেন।

বসু দম্পতি নিবেদিতার সঙ্গে অজন্তা ভ্রমণেও গেছেন। তখন সেখানে অসিত কুমার হালদার এবং নন্দলাল বসু গুহাচিত্র আঁকছিলেন। পরবর্তীকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের স্থাপত্য ও সভাগৃহের আলঙ্করণে অজন্তা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল। কেদার-বদ্রী ভ্রমণ জগদীশচন্দ্রের জীবনে খুব আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় হয়েছিল। অন্ধ যাত্রীর ঈশ্বর নির্ভরতা, 'জয় কেদারনাথ কি জয়', 'জয় বদ্রী বিশাল কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত পারস্পরিক প্রেম সম্বোধন প্রভৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। গেডিসকে তিনি বলেছেন— ''এই সব অভিজ্ঞতা দিয়েই ভারত আমাকে তাঁর সন্তান করে রেখেছে। সব কিছুর মাধ্যমে তাঁর জীবন ও ঐক্যকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি।''

১৯১৭ সালে ৩০ নভেম্বর নিজ জন্মদিনে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন। তখন আর নিবেদিতা এই ধরাধামে নেই। ''ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম--- জগদীশচন্দ্র বসু'' এই বৎসর বসু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠারও শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষের সঙ্গে এই সমাপতন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

''সর্ব জাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। ...এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার... জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোনো পেটেন্ট লওয়া হইবে না, কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থ লাভের উপায় নহে।'' তিনি বেতার পরীক্ষার পেটেন্ট নেননি, যদিও ব্রিটিশ শিল্পপতিরা তাঁকে এর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তবে পরে নিবেদিতা ও বুলের প্রচেষ্টায় একটি পেটেন্ট নিয়েছিলেন। কিন্তু তা কোনোদিন তিনি ব্যবহার করেননি।

জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার অবদান বিস্মৃত হননি। বিজ্ঞান মন্দিরের ছত্রে ছত্রে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন। তাঁর পবিত্র ভস্মাস্থির উপর বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন প্রবেশপথে Lady with the Lamp হলো নিবেদিতার স্মরণ। ১৯১৭ সালে নিবেদিতার বোন উইলসনকে লেখেন— ''The institute is the embodiment off her prayer". ১৯৩৭ সালে ৭ অক্টোবর জিন হারবার্টকে লেখেন— ''...it was her strong belief in the advance of Modern Science accomplished by Indian men of Science that led me to found my research institute.'' ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিবেদিতার গভীর বিশ্বাসই গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের প্রেরণা। বোন উইলসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্রের (২৭.১০.১৯১৬) সবিশেষ বর্ণনা— ''যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি— সকলে বলছে একজন মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব— তাহলে সেসব কিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে। ...বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও সুন্দর হবে। প্রবেশ পথে বাম পার্শ্বে পাথরের একটি বিরাট পদ্ম—পদ্মটিই জলাধার, যার উপর সত্যিকার পদ্ম ফুটবে। তার উপরে রিলিফ মূর্তি, এক নারীর, হাতে জপমালা এবং প্রদীপ। এই বিজ্ঞান মন্দির তাঁরই প্রার্থনা মূর্তি। ১৩ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হয়েছে। দুটি প্রস্তর বেদি থাকবে, ঝুঁকে পড়বে একটি শেফালি গাছ, যা প্রতি বিকেলে ঝরিয়ে দেবে শুভ্র ফুলগুলি, মাটির উপর বিছিয়ে যাবে ঘন আস্তরণ। এর বীজ তিনি এনেছিলেন অজন্তা থেকে এবং বিদ্যালয় ভবনে রোপণ করে যে কয়েকটি চারা তৈরি করেছিলেন, তারই একটি এনে বসিয়েছি।'' নিবেদিতার প্রয়াণের পর হিন্দুমতেই তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। বশীশ্বর সেন ভস্ম নিয়ে এসেছিলেন। তার কিয়দংশ বসু মন্দিরের ভিত্তি ভূমিতে প্রোথিত করা হয়। তিনি সুন্দর বর্ণনা করেছেন— ''When the Bose Institute was found, Sir J.C. Bose asked me put some of her ashes there. At the base of the foundation I put a little box containing Nivedita's ashes, just where the bas-relief of Sister Nivedita has been placed. Except Lady Bose, no one else knew it'' প্রতিষ্ঠা ভাষণে বললেন— ''বিধাতার কৃপা হইতে কোনোদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান হইয়াছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।'' বলা বাহুল্য— তিনি ওখানে নিবেদিতা ও ওলিবুলকে স্মরণ করেছেন। এছাড়াও জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার রচনা প্রকাশ করেছেন--- (হারবার্টকে চিঠি—৭.১০.১৯৩৭) ''All Mss left by her I collected and published through Messers. Longman, Green & Co. the two books named as "Footfalls of Indian History" and "Studies from an Eastern Home". এই চিঠিতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, অবলা বসু নিবেদিতার স্মৃতিতে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নিবেদিতা হল করে দিয়েছেন, যেখানে নিবেদিতার সুন্দর একটি রঙিন চিত্র রাখা আছে। এছাড়াও ক্রিস্টিন যাতে তাঁর বাড়িতে থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্কুল চালাতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে ক্রিস্টিন তাঁর বাড়িতে বেশিদিন থাকেননি।

নিবেদিতার প্রেরণায় অলিবুল তাঁর উইলে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অনেক অর্থ দান করেন, নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্যও প্রভুত অর্থ বরাদ্দ করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনায় তথা ভারতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতা অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু বিজ্ঞান কেন, আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিবেদিতার অবদান অবিস্মরণীয়। নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষে শাস্ত্রকথিত পিতৃঋণ, মাতৃঋণের সঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি 'ভগিনী' ঋণ।

উৎস :

১. লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করী প্রসাদ বসু।

২. Vedanta Kesari, Novm 2014.3

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি

অতিথি কলম

এ পানাগড়িয়া

সুইডেনের প্রখ্যাত অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ জোয়ান নরবার্গের প্রোগ্রেস নামের বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইকোনোমিস্ট পত্রিকা সম্প্রতি লিখেছে, 'মানুষ সাধারণত ধরেই নেয় বাস্তবে পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হলেই তা নিশ্চয়ই যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে। আর এরই ভিত্তিতে তারা আশু বিপদের সম্ভাবনা যদি কিছু আদৌ থেকেও থাকে তাকে তিন গুণ বাড়িয়ে তোলে। এটা আতঙ্ক কিন্তু বাস্তবে পাওয়া ডাটাগুলির ভিত্তিতে নয়। আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয় কোনো একটা উদাহরণের ভিত্তিতে। আর স্মৃতিতে খারাপ অভিজ্ঞতাগুলিই বরাবর তরতাজা থাকে'।

ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে চলা বিতর্কের ক্ষেত্রটিকে বোঝাতে এই উদাহরণটি বেশ খাপ খায়। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অবধি দেশের প্রকৃত জিডিপি-র বৃদ্ধি ঘটেছে গড়ে ৭.৫ শতাংশ হারে।

মনে রাখা দরকার, বিগত ইউপিএ-২ সরকারের শাসনকালের শেষ দু' বছরের গড় জিডিপি বৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশ। এর ওপর ভিত্তি করেই ৭.৫-এ পৌঁছনো গেছে। কিন্তু সেন্ট্রাল স্টেটিস্টিক্যাল অফিস (সিএসও) যখন ২০১৪-১৫-এ ৭.৪ শতাংশের মতো ঈর্ষণীয় বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিল তখন অধিকাংশ ভাষ্যকার যাঁর মধ্যে আমাদের দেশের অগ্রগণ্য প্রথম সারির বহু অর্থনীতিবিদও ছিলেন তাঁরা এই সংখ্যাকে পত্রপাঠ বাতিল করে ঘোষণা করলেন যে সরকারি তথ্যের সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব পণ্ডিতি হিসেবের গরমিল হচ্ছে। তাঁদের কথায় বাস্তব পরিস্থিতিও শুধু তাঁদের হিসেবের সঙ্গেই সাযুজ্য রাখতে পারছে, সরকারি তথ্যের সঙ্গে নয়। আবহাওয়াটা এমন হয়ে গেল যে সত্যিই যদি অর্থনীতি এত দ্রুতগতিতে এগোয় বাস্তবে তা ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সবটাই কি কল্পনা?

বিভিন্ন করপোরেট সংস্থার লাভের ঘাটতি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংকোচনের প্রমাণ উল্লেখ করে তাঁরা বললেন সরকার মূল্যায়নের যে নতুন পদ্ধতি বার করেছে আর যার ওপর ভিত্তি করেই এই সংখ্যাতথ্য তৈরি হয়েছে সেটি গোড়াতেই ত্রুটিযুক্ত। এই অভিযোগগুলির বিশেষ করে প্রায়োগিক সমালোচনা (Methodological criticism)-এর সঙ্গে সঙ্গে করপোরেট লাভের মুখ থুবড়ে পড়া থেকে করপোরেট বিনিয়োগ ঘাটতি প্রত্যেকটিরই পুঙ্খানুপুঙ্খ উত্তর দিয়েছিলেন সরকারের মুখ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক টিসিএ আমানস্থ। করপোরেট সংখ্যাগুলির লভ্যাংশ কমে যাওয়ার বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট সংস্থা ধরে ধরে যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বিষয়টি কাল্পনিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহা মূল্যবান প্রশ্নটি হচ্ছে— তাহলে নিরেট সংখ্যাতথ্যের ভিত্তিতে আমরা কী পাই? করপোরেট সঞ্চয় বলতে বোঝায় করপোরেট সংস্থার লাভ ও নতুন সঞ্চয়পত্র কেনা। এই হিসেবের চূড়ান্ত তথ্য আসতে এক বছর লাগে। সেই অর্থে কেবলমাত্র ২০১৫-১৬ সালেরই পুরো তথ্য আমাদের হাতে আছে।

২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ সালে করপোরেট সঞ্চয় গড়ে জিডিপি-র ১১.৮ শতাংশ ছিল। এর বিপরীতে ২০০৩-০৪ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে যখন অর্থনীতি উদ্দাম বেগে দৌড়চ্ছিল যার ফলে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৩ শতাংশ তখন করপোরেট সঞ্চয় ছিল জিডিপি'র মাত্র ৭.৪ শতাংশ। বাস্তবে করপোরেট সঞ্চয়কে যদি মানদণ্ড ধরতে হয় তাহলে ২০১৪-১৫, ১৫-১৬ দুটি ক্ষেত্রেই তা ২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২-এর মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি অর্থবর্ষের সঞ্চয়ের থেকে অত্যন্ত বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকবে। অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০১২ —এই ৮ বছরে করপোরেট ক্ষেত্রে প্রতি বছর যত সঞ্চয় হয়েছে ২০১৪-১৫ আর ১৫-১৬ এই দু'

> "যে পদ্ধতি সর্বৈব ত্রুটিযুক্ত বলে তাঁরা (পণ্ডিতরা) আগের বৃদ্ধিগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকারের পথে নেমেছিলেন এখন কিন্তু সেই পদ্ধতিতেই উল্লেখিত ঘাটতিকে সর্বাংশে সত্য বলে ধরে নিয়ে দেশের আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করতে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

বছরে তার থেকে অনেক বেশি শতাংশ হয়েছে।

হ্যাঁ, একথা সত্যি যে চিরাচরিত শিল্পক্ষেত্রগুলি অর্থাৎ নির্মাণ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি মন্দার মুখে পড়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে যানবাহন, যানবাহন-সংক্রান্ত উৎপাদন শিল্প, দু' চাকার স্কুটার বাইক, ওযুধপত্র ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের সাফল্য উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলির দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক্ষেত্রেও ইতিবাচক উদাহরণগুলির থেকে নেতিবাচকগুলি নিয়েই চর্চা চলছে। এমনকী অকাট্য সংখ্যাতথ্যের হিসেবকেও এই নেতিবাচক প্রচারের ছায়ায় ঢেকে দেওয়ার চেষ্টারও অন্ত নেই।

প্রশ্ন হলো, জিডিপি-র কত পরিমাণ শতাংশের হিসেবে করপোরেট বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত? ২০১৪-১৫ ও ১৫-১৬ আর্থিক বছরে এটি ছিল গড়ে ১২.৯৫ শতাংশ যা ২০০৩-০৪ ও ২০১১-১২- এর ১২.৪ শতাংশের থেকে অবশ্যই বেশি। তাই যে ধুয়ো তোলা হচ্ছে, জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করপোরেট বিনিয়োগ বাড়তে পারেনি তাও ধোপে টেঁকে না।

অবশ্যই Average Gross Capital formation (GCF) জিডিপি-র অনুপাতে ৩১.৯ শতাংশ হয়েছে ২০১৪-১৫ ও ১৫-১৬-তে। ২০০৩-০৪ ও ২০১১-১২-এর ৩৪.৬ শতাংশের থেকে তা অবশ্যই কম। কিন্তু তার মানে এটা কখনই বোঝায় না যে তা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বরঞ্চ অর্থনীতিতে গড়ে ৭.৫ থেকে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষমতা এই পরিমাণ করপোরেট বিনিয়োগের অবশ্যই রয়েছে। সংখ্যাতথ্যের হিসেব বলছে ২০০৩-০৪-এর ৮.১ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির সময় এই ক্যাপিটাল ফরমেশন বা মূলধন সৃষ্টির মাত্রা ছিল জিডিপি-র ২৬.১ শতাংশ।

সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসের দাখিল করা সর্বশেষ দুটি ত্রৈমাসিকের হিসেব অনুযায়ী (ত্রৈমাসিক জুন, ২০১৭) বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৬.১ শতাংশ ও ৫.৭ শতাংশ। আর এই পতনের ফলেই সমালোচকরা হাতে চাঁদ পেয়ে গেছেন। আশ্চর্যের কথা পরিসংখ্যানে ঘাটতি ঘটলেও হিসেবের পদ্ধতিতে কিন্তু নতুন কোনো কৌশল প্রয়োগ হয়নি। যে পদ্ধতি সর্বৈব ত্রুটিযুক্ত বলে তাঁরা (পণ্ডিতরা) আগের বৃদ্ধিগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকারের পথে নেমেছিলেন এখন কিন্তু সেই পদ্ধতিতেই উল্লেখিত ঘাটতিকে সর্বাংশে সত্য বলে ধরে নিয়ে দেশের আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করতে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নিশ্চিতভাবেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সরকারকে যত্নবান হতে হবে। যা তারা হচ্ছেও। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ফাটাবার মতো কিছু আদৌ ঘটেনি। অতি সক্রিয়তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা অর্থনীতির মৌলিক অবস্থানে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি। এ সংক্রান্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানও নেই। আমরা ২০১৬-১৭ সালের জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান এখনও হাতে পাইনি কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে তা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। বরং, সাম্প্রতিককালে সরকারের তরফে যে যুগান্তকারী সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি সঙ্ঘটিত হয়েছে অর্থাৎ বিমুদ্রীকরণ বা জি এস টি বা সেই অর্থে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অনুৎপাদক সম্পদগুলিকে (এনপিএ) চিহ্নিত করে তাকে পরিচ্ছন্ন করার অভিঘাতের ফলেই সাময়িকভাবে জিডিপি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছে এটাই বলা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সব দিক বিচার করার পরই সরকারকে এগুতে হবে। হঠাৎ করে কাল্পনিক বিপদ ধরে নিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ খরচের কোনো প্রয়োজন নেই। রাজস্ব ঘাটতি ক্ষেত্রে একটা স্থিরতা আনতে (আমদানি রপ্তানি ও অন্য খরচ নিয়ে যে Revenue Deficit) বিগত তিন বছরে সরকারকে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। অর্থনীতির অধঃপতনের কোনো নির্ভেজাল, অকাট্য প্রমাণ হাতে না পেয়ে সেই অর্জনটিকে কিছুতেই ভাসিয়ে দেওয়া যায় না।

এখানে বলা দরকার, দেশের অর্থনীতিতে দুর্বলতম অংশ দু'টি। দ্বৈত ব্যালান্স সিটের সমস্যা ও রপ্তানি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য না আসা। দ্বৈত ব্যালেন্স সিট বলতে বোঝায় ব্যাঙ্ক থেকে যে বড় বড় করপোরেট সংস্থা ঋণ নিয়েছিল তারা প্রাপ্ত অর্থের পরিপূরক সম্পদ ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রাখেনি। ফলে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে না পারায় অনেকে ক্ষতির মুখ দেখছে অন্যদিকে টাকা ফিরে না আসায় ব্যাঙ্কের এনপিএ বেড়ে ক্ষতি বাড়ছে। দু' তরফের ব্যালেন্স সিটই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর বি আই এই সমস্যাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তাদের এই কাজকে উৎসাহ দিতে সরকারের উচিত অচিরে ব্যাঙ্কগুলিকে Recapitalise করা, তাহলে সরকারি অর্থের সদব্যবহারই হবে।

পণ্য রপ্তানি ২০১২ সালের ২৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৬ সালে ২২৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসাটা নিশ্চয় উদ্বেগের। এই ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নিদান দেওয়ার বিষয়টি আর বি আই-এর এক্তিয়ারভুক্ত। ইদানীং কয়েক বছরে টাকার দাম কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের নিরিখে অনেক বেড়েছে। এই বৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে হলেও কমাতে হবে (এগুলি নিতান্তই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাজ)। অর্থাৎ টাকার দাম যাতে পড়ে যায় সেদিকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ১ ডলার দামের কিছু রপ্তানি করলে এখন ৬৪ টাকা (আনুমানিক) পাওয়া যায়, টাকার দাম ১০ শতাংশ কমলে ৭২ টাকা পাওয়া যেতে পারে। এরকম আরও কিছু অর্থনৈতিক কৌশল আছে। দীর্ঘ মেয়াদে সরকার কর ব্যবস্থায় আরও সংস্কার করে হার কমাতে পারে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরও সুবিধে দিতে পারে। সর্বোপরি দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা জরুরি। এগুলির ফল রূপায়ণ হলে শুধু রপ্তানিই বাড়বে না সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রটিও প্রসারিত হবে। ■

ভোটের ফাঁদে যখন হিন্দুধর্ম

আজ এই রাজ্যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে, যেখানে প্রতি পদে পদে ধর্মীয় ভাবাবেগকে শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং সেটি করা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাত দেখিয়ে। যেমন ধরা যাক দুর্গাপূজা, এই পুজোকে কেন্দ্র করে গত প্রায় তিন বছর ধরেই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছে। শুধুমাত্র উচ্চতার জন্য প্রতিমা দেখার যে একটা কৌতূহল গোটা দেশ জুড়েই তৈরি হয়েছিল এবং কলকাতায় এই পুজোকে কেন্দ্র করে আমরাও বেশ বাঙালি হিন্দু হিসেবে গর্বিত বোধ করছিলাম হাঠাৎই এই রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতায় তা বন্ধ হয়ে গেল। কারণ হিসাবে কী আমরা জানতে পারলাম— ভিড়ের চাপ সহ্য করা সম্ভব ছিল না। অথচ আমরা দেখেছিলাম জামাতে উলেমা-এ-হিন্দ্ নামক একটি সংগঠনের প্রবল ভিড়ের চাপ এবং সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কিছু শান্তিকামী গোঁফহীন দাঁড়িওয়ালাদের কলকাতা পুলিশকে পেটানো। আর মজার ব্যাপার পরের বছর সেই জনসভায় নেতা সিদ্দিকুল্লার সভায় মন্ত্রীদের উপস্থিতি। যাই হোক, সেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আজ আবার মন্ত্রী না এমএলএ পদে আসীন।

আমরা শুনলাম নলহাটির দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ? না জানা যায়নি আজও। রথযাত্রা আর ইদ পরপর পড়ায় দু'এক জায়গায় রথের রাস্তা পরিবর্তন করতে হয়, কোথাও আবার রথযাত্রার অনুমোদনও পাওয়া যায়নি।

দুর্গাপূজা আর মহরম পরপর পড়ায় গত বছরও বিসর্জনের উপর খাঁড়া নামানোর চেষ্টা হয়েছিল। তবে এই বছর যেন, সব কিছুকেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া দেওয়ার স্টাইলে ঘোষণা, ''দশমীর দিন সন্ধ্যা ছটার মধ্যে বিসর্জন করতে হবে, নইলে একাদশীর দিন বাদ দিয়ে আবার দ্বাদশী থেকে বির্সজন করা যাবে।'' আর এই ফতোয়া কার্যকর করার দায়িত্ব নেওয়া পুলিশের সর্বস্তরের কর্মচারীরা রাজ্য জুড়ে তড়িঘড়ি ক্লাব সংগঠন, বাড়ির পূজা, পাড়ার পূজা কমিটিকে থানামুখী করে হুমকি মিশ্রিত সুরে বোঝানো এবং মুচলেখা দেওয়ার মতোই লিখিত ভাবে বিসর্জনের তারিখ লিখিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ করে নিলেন। কী অদ্ভুত তাই না? বোধনের বাজনা শোনার আগেই বিসর্জনের চিন্তা শেষ এ যেন সন্তানসম্ভবা মা-কে শোনানো হচ্ছে আগামীতে জন্ম নেওয়া সন্তানের মৃত্যু কবে হবে।

বিসর্জনের দাবি আদায় করতে আমাদের ছুটতে হয় হাইকোর্টের দরজায়। ধন্যবাদ জানাই সেই সব উকিল বন্ধুদের যারা হিন্দুত্বকে টিঁকিয়ে রাখার লড়াইটা লড়লেন...।

হাইকোর্টের মামলা চলাকালীন আবার মুখ্যমন্ত্রী নতুন ফতোয়া জারি করলেন— ''বিজয়াদশমীতে শস্ত্রপূজন বা অস্ত্রমিছিল করা যাবে না''। আমরা বিস্মিত। গোটা দেশের প্রায় সর্বত্রই এই দিনে শস্ত্রপূজন হয় কোথাও কোনও বাধা নেই। এমনকী বিগত দিনে বাম আমলেও দশমীতে শস্ত্রপূজন নিয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা আমার জানা নেই...। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নাক ফুলিয়ে তর্জনী তুলে জানালেন, এ রাজ্যে তিনি অস্ত্র নিয়ে কিছু করতে দেবেন না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রামনবমীতে অস্ত্র মিছিল দেখে আমাদের রাজ্যের বিজ্ঞ মন্ত্রী আর বুদ্ধিবেচার দল দাঁত বের করে বলেছিল, 'রামের জন্মদিনে অস্ত্র? হেঁ হেঁ হেঁ, রাম কি জন্মের সময় অস্ত্র নিয়ে জন্মেছিল?'' আসলে এনারা ভুলেই গেছেন জন্মের সময় কলম নিয়ে না জন্মালেও আমরা কবিগুরুর জন্মদিনে কবিতা গান পাঠ করি।

কথাঞ্জলি সারদাঞ্জলি, নারাদাঞ্জলি দেখা এই চোখ পঞ্জিকাঞ্জলিও মনে হয় কদিন পরে দেখতে চলেছে...আসলে রাজ্যে সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়ার দিন আগত যে। এবার ভাবতে হবে কেন এই পরিস্থিতি? শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে আজ এই রাজ্যে হিন্দুত্ব বিপণন, প্রকারান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাও বিপণন। কারণ হিন্দুত্ব

চিঠিপত্র

বাঁচলেই সেকুলারত্ব, বুদ্ধিবেচাত্ব, সব বাঁচবে নইলে রোহিঙ্গাস্তান, জামাতেস্তান, হুজিস্তান হলে সব শেষ হয়েই যাবে। সামান্য একজন হিন্দু রাজ্যবাসী হিসেবে আমি যদি বলি... দশমীর অস্ত্র পূজায় নিষেধাজ্ঞা কিন্তু মহরমের অস্ত্র নিয়ে আস্ফালনে চুপ কেন?

বিসর্জনে নিষেধাজ্ঞা চাপানো সহজেই হয় কিন্তু মহরমের রুট বদলানোর কথা ভাবাও হয় না। দুর্গাপুজা নতুন করে করতে পারমিশন নিয়ে টালবাহানা চলে কিন্তু প্রতি বছর মহরমের তাজিয়া আখাড়া বেড়েই চলেছে পারমিশন ছাড়াই। রোহিঙ্গা মুসলমান নিয়ে এতো চিন্তিত অথচ বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে কেউ কিছুই বলেননি। মোহন ভাগবতজীর কলকাতায় সভা করতে গেলে আটকে দেওয়া হয়, অথচ রোহিঙ্গা মুসলমানদের দেশে থাকতে দেওয়ার দাবিতে কলকাতায় গোঁফহীন দাড়ির সমাবেশ হয় বহাল তবিয়তে। এ এক বাজে পরিস্থিতি যেখানে রাজ্য সরকার বারংবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই রাজ্যে ''ভোটের ফাঁদে হিন্দুধর্ম''।

—রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাউড়িয়া, হাওড়া।

দেশদ্রোহী

গত ২১ আগস্ট ২০১৭ 'স্বস্তিকায়' প্রকাশিত রন্তিদেব সেনগুপ্তের প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'বামপন্থীদের ইতিহাসটাই দেশদ্রোহিতার' মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। বামপন্থীরা যে ভারতবর্ষকে কখনই ভালোবাসেনি বা ভারতবর্ষকে ভারতমাতা বলে সম্বোধন করেনি সে বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত। তাদের ধ্যানজ্ঞানই ছিল নিজ নিজ দল এবং পূর্বপুরুষ অর্থাৎ মাও-সে-তুঙ, কার্লমার্কস, এঙ্গেলস লেনিন প্রমুখ ব্যক্তিরা। বামপন্থীদের কাছে ভারতীয় মহাপুরুষ বা দার্শনিকরা ছিলেন অবহেলিত ও নিন্দিত।

প্রতিবেদক বামপন্থীদের দেশদ্রোহিতার বেশ কিছু উদাহরণ সুনিপুণ ভাবে তাঁর নিবন্ধে তুলে ধরেছেন যা অতীত এবং বর্তমানে এক জ্বলন্ত সমস্যা। এই প্রসঙ্গে আমারও কিছু বক্তব্য আছে এবং তা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি— (১) বামপন্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছেন— বুর্জোয়া কবি। তিনি নাকি জমিদার বাড়ির সন্তান ছিলেন বলে তাঁর এত কদর। অথচ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি তথা কবিগুরু। (২) স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বামপন্থীদের বিশ্লেষণ ছিল— উনি চাকরি পাননি বলে বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। অথচ স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৩) ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে বামপন্থীদের মূল্যায়ন ছিল— উনি বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষ তথা 'পাগল'। অথচ ঠাকুর পেয়েছিলেন মা ভবতারিণীর দর্শন। এবং তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

বামপন্থীদের এইরকম ভণ্ডামি ভারতীয় ইতিহাসে অনেক রয়েছে। তারা আফজল গুরুর ফাঁসি হলে প্রতিবাদ করে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে। দেশদ্রোহী কাসভের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হলে ভারত সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়। তথাকথিত ছাত্রনেতা কানাহাইয়া কুমার কাশ্মীরকে স্বাধীন করার কথা বললে তাকে সমর্থন জানায়। তাই বামপন্থীরা দেশভক্ত নয় সত্যিকারেরই দেশদ্রোহী।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পূজার পূর্বে যারা প্রাপ্য মহার্ঘভাতার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রচুর রাগ প্রদর্শন করে তাদের উদ্দেশে প্রত্যক্ষভাবে যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন সংবাদপত্র মারফৎ, তা ক্ষমার অযোগ্য। নির্বাচনের স্বার্থে এতজনকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাইকেল, ইমামভাতা, ক্লাবগুলিকে প্রত্যেককে দু' দফায় তিন লাখ করে দিলেন, অথচ সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিলেন না কেন? তারা তো হকদার। পুজোর পূর্বে তাদের এইভাবে বিফল মনোরথ করে দেবার অসৎ ইচ্ছা কেন?

যেভাবে অশালীন বাক্য প্রয়োগ করে সরকারি কর্মচারীদের জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাতে একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেল, ''রতনে রতন চেনে শুয়োরে চেনে কচু''। যারা ওনার কথায়, ঘেউ ঘেউ ও মিউ মিউ করছেন তারা যে মহার্ঘ ভাতার জন্য ওই প্রকার শব্দ করছে সেটা উনি জানলেন কী করে? তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যারা ওই শব্দ করছেন তাঁরা নিজ নিজ স্বজাতিকে চিনতে পেরেছেন তাই কথায় না বলে ডাক দিয়ে জানান দিয়েছেন। স্বজাতির বুঝতে অসুবিধা হবে না বলে। উনি কী বলেন? বাকিরা যাতে কেউ বুঝতে না পারে তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে মনে হয় সারমেয় ও মার্জারকুল।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

শিবাজী মহারাজ

প্রদীপ ঘোষ তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ৫.৬.১৭) বলেছেন— আফজল খাঁ আলোচনার ছলে শিবাজীকে কাছে ডেকে আনে এবং আলিঙ্গনের ছলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। পরিচ্ছদের নীচে বর্ম থাকায় শিবাজী বেঁচে যান এবং সঙ্গে থাকা বাঘনখ ও ছুরিকা দিয়ে আফজল খাঁকে মারাত্মক আহত করেন। তাঁর সঙ্গীরা আফজল খাঁর মুণ্ড কেটে নিয়ে প্রতাপগড় দুর্গে ফিরে যান...। ব্রিটিশ আমলে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ওই কথাই পড়েছি। কিন্তু বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালার বক্তব্য, (চিঠিপত্র, ১০ জুলাই) তথ্যটা একেবারেই উল্টো। ইতিহাসসিদ্ধ তথ্য হচ্ছে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী প্রথম আঘাতে আফজল খাঁকে মেরে ফেলেছিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীকে আঘাত করার সুযোগই পায়নি। সে সুযোগ শিবাজী ওঁকে আদৌ দেননি। বাসুদেববাবু তাঁর 'ইতিহাসসিদ্ধ' তথ্যের সূত্র উল্লেখ করেননি। তাই, স্যার যদুনাথ সরকার ওই বিষয়ে কী বলেছেন, দেখা যাক।

স্যার যদুনাথ তাঁর 'শিবাজী' নামক গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯২৯; প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭৩) বলেছেন--- ''...শামিয়ানার মধ্যস্থলে যে বেদীর মতো অল্প উঁচু স্থানে আফজল খাঁ বসিয়াছিলেন, শিবাজী তাহার উপর চড়িলেন। খাঁ গদী হইতে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। শিবাজী বেঁটে ও সরু, তিনি বিশালাকায় আফজলের কাঁধ পর্যন্ত উঁচু। সুতরাং খাঁর বাহুদুটি শিবাজীর গলা ঘিরিল। তারপর হঠাৎ আফজল খাঁ শিবাজীর গলা নিজ বাহু দিয়া লৌহবেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন। এবং ডান হাত দিয়া কোমর হইতে লম্বা সোজা ছোরা (যম্‌ধর) খুলিয়া শিবাজীর বাম পাঁজরে ঘা মারিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্মে বাধিয়া ছোরা দেহে প্রবেশ করিতে পারিল না। গলার চাপে শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মতো হইল। কিন্তু এক মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফজল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া তাঁহার পাকস্থলীর পর্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, খাঁর ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। আর ডান হাতে 'বিছুয়া' লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফজল খাঁর বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল; এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজ সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন। এসব ঘটনা এক নিমেষে শেষ হইল...।''

বাসুদেববাবুর 'ইতিহাসসিদ্ধ' তথ্য মানতে হলে, স্যার যদুনাথের তথ্যকে 'অসিদ্ধ' বলতে হয়।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

জড় চৈতন্যের যুদ্ধজয়ী প্রভু জগদ্বন্ধু

অমিত ঘোষদস্তিদার

পরম্পরা

চিরকুমার ব্রহ্মচারী হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে বলে নাচেন, কাঁদেন, হাসেন আবার কখনও বা গান গেয়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই তাঁর কাজ শ্রীহরির অনুসন্ধান করা। কেউ তাঁকে বলে দেয়নি, কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয়নি। অনেকেই তাঁকে পাগল বলে। এই মহান পাগলের নাম মহেন্দ্র। যশোহরের নড়ালের ফুলবদিনা গ্রামে তাঁর জন্ম। হরির টানে বৃন্দাবনে, তারপর এক মহান সন্ধিক্ষণে শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু হরি আপন চিরদাসকে, যে দাস পরে মহেন্দ্রজী বলে খ্যাত হয়েছেন, তাঁকে বৃন্দাবন থেকে নিজ চিরসেবায় নিযুক্ত করে রাখলেন।

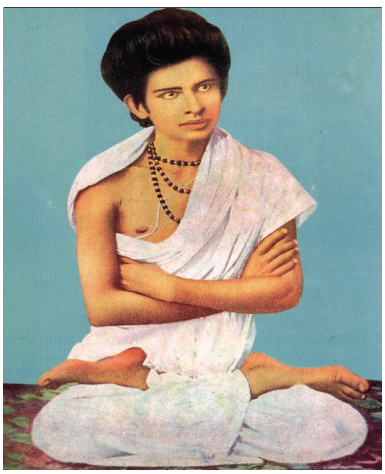

জগৎসভার মাঝে দাঁড়িয়ে মহানামব্রতজী 'জগদ্বন্ধু' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন— 'প্রভু জগৎবন্ধু বলেছেন— আপনারা বেদ মানেন তো? কী কী জাতি মানেন? আমি মানি এক মানবজাতি, পশুজাতি এইসব।' একমাত্র মানবধর্ম পালন করলেই আপনার জীবন সুখকর হবে, সমাজ কল্যাণময় হবে, রাষ্ট্র কল্যাণময় হবে, বিশ্ব-সংসারের শান্তি ফিরে আসবে। তা না হলে এ বিশ্ব-সংসারে কেবল দ্বন্দ্ব কেবল মারামারি, কেবল হানাহানিই চলবে। মানুষের জীবনে সত্যিকারের শান্তি আসবে তখন, যখন মানুষ মানুষের মতো বাস করতে শিখবে। বিশ্বমানবের এই একটিই ধর্ম— মানবধর্ম। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের বাণী— 'এক মর্ম, এক ধর্ম, জীবভজন।' হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বই হলো মানবের ধর্ম। এই ধর্ম হলো 'সনাতন ধর্ম'। ঋষিরা কন্‌ভার্ট করতেন না, তাঁরা মনুষ্যত্বের প্রচার করতেন। বিশ্বস্রষ্টার পূজা করতে বলতেন, কারণ উপনিষদ জানাচ্ছে, 'বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।'

কাঙাল কুঞ্জদাস জানাচ্ছেন, 'অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। তাঁহার কথাই অমৃত। ...শ্রীশ্রীবন্ধুকথা সর্ববিধ দুঃখ বিনাশক এবং শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলস্বরূপ, অর্থ বিচারের অপেক্ষা করে না। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ যুক্ত তাঁহারা, যাঁহারা শ্রীবন্ধুহরি-কথা কীর্তন করেন। তাঁহাদের ন্যায় দাতা আর কেহই নাই। জয় জগদ্বন্ধু।'

দীনহীন গোপীবন্ধুদাস বলছেন— শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলাকথা বর্ণনে পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুত নবদ্বীপ দাস, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দাদাজীবন প্রমুখ পরমাধিকারী ভক্তগণ মুক্তকণ্ঠ। ইহারা লীলার সাক্ষাৎ সঙ্গী। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বলছেন, সংসার সাগরে কূলকিনারা দেখিতে না পাইয়া যখন যাত্রী বিমূঢ় ও দিগভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সৎপ্রসঙ্গ, ভগবদ্‌গুণ-গাথা লীলালহরী যেন দিকের সন্ধান দেয়, যেন বলিয়া দেয়— ওদিকে আঁধার, এদিকে আলো; ওদিকে মৃত্যু, এদিকে অমৃত।

কোমরপুর গ্রামটি ফরিদপুর জেলায়— গোয়ালন্দের পাশে। পদ্মার গর্জনে কোমরপুরে প্রলয়াতঙ্ক, শ্রীদুর্গা প্রতিমা-সহ এক ব্রাহ্মণ পরিবার নৌকায় করে অজানার উদ্দেশ্যে ভাসতে ভাসতে ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে গোবিন্দপুরে এসে পৌঁছন। গোবিন্দপুর গ্রামের হৃদয়বান মুক্তারাম নৌকার আরোহীদের পরম শ্রদ্ধায় নামিয়ে আনলেন। শম্ভুনাথ তাঁর নাম জানালেন মুক্তারামবাবুকে, আরও জানালেন তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী, সঙ্গে থাকা ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনি আমার খুল্লতাত স্বর্গীয় কৃষ্ণধন চক্রবর্তীর পুত্র, নাম শ্রীমান আরাধন চক্রবর্তী।

শম্ভুনাথের দুই পুত্র—ভৈরবচন্দ্র এবং দীননাথ। দুই কন্যা— হরসুন্দরী এবং কাশীশ্বরী। দীননাথের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরাধন চক্রবর্তী নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে আরাধনের যে চতুষ্পাঠী ছিল, দীননাথ সেই স্থানেই অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী দীননাথকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ফরিদপুর জেলার অন্য একটি গ্রামের নাম কাফুরা। সেখানে শ্রীযুত শীতলচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী রাজলক্ষ্মী দেবী বাস করতেন। তাঁদের অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা বামাসুন্দরীর সঙ্গে শুভক্ষণে দীননাথের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। খ্রিস্টিয় আঠারোশত একাত্তর অব্দ, আটাশে এপ্রিল ব্রাহ্ম মুহূর্তে— সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে 'জন্ম মাহেন্দ্রক্ষণ'-এ দীননাথ এবং বামাসুন্দরীর সন্তান পৃথিবীতে এলেন। নামকরণের দিন ধররত্ন সব ফেলে শ্রীচৈতন্যভাগবত শিশুমণি তাঁর দুই হাত দিয়ে ধরে রাখলেন। বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনী করে উঠলেন। পুত্রের মুখে মহাপ্রসাদ অর্পণ করা হলো। নাম রাখা হলো— জগদ্বন্ধু।

মানুষকে জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযমী হওয়ার পরামর্শ দেন। কখনও তিনি মৌনব্রতপালন করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বক্তব্য লিখে জগৎমাঝারে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন— মানবধর্ম সমাচার, কখনও আবার সুললিত কণ্ঠে সহজ সরলভাবে বন্ধুর মতন মানুষকে বুঝিয়ে গেছেন— বন্ধুত্বের মিলন কথা। জগদ্বন্ধু বলেন— ''মহাপাপ হরি হিংসা। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে হরি আছেন, জীবকে হিংসা করলেই হরি হিংসা করা হয়।

'হিন্দু'-র বিশ্লেষণে জগদ্বন্ধু বলছেন— 'হিন্দু' হলো— হীনতা দূর হইয়াছে যাহার। হীনতা অর্থ হিংসা করা, চুরি করা, মিথ্যা বলা এই তিন দোষ নাই যাহার— সেই ভদ্র। হিন্দু অর্থ ভদ্র। প্রকৃত হিন্দু যে, সেই ভদ্রলোক। একজন হিন্দু আর একজনকে ভদ্র বলিয়া ডাকে। প্রত্যেক মানুষকেই প্রথমে ভদ্রলোক হইতে হইবে। অভদ্র কে? যে হিংসা করে, চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে।

দর্শনমাত্রই যিনি জগতের বন্ধু হতে পারেন, জড় ও চৈতন্য যুদ্ধে জয়ী, সেজনকেই তো একমাত্র জগদ্বন্ধু বলা যায়। ∎

হিন্দু বাঙালি প্রথায় ইলিশ বাঁচান

দেবপ্রসাদ মজুমদার

সনাতন হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও প্রথা নিয়ে কিছু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় ও সুধী সমাজের ব্যক্তিদের নানান ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি করতে শোনা যায়। কিন্তু তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে ওই সকল ধর্মীয় রীতিনীতি কেন তৎকালে প্রজ্ঞাবান ঋষি বা পণ্ডিতরা সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে ধর্মকে সামনে রেখে যদি জনমানসকে পরিচালিত করা যায় তবে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ তা সহজে গ্রহণ ও মান্য করবে, এতে ওই প্রথা বা রীতিনীতির সুফল তারা অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হবে। কারণ এই ভারতভূমিতে এখনো যুক্তিতর্ক অপেক্ষা বিশ্বাসের স্থান অনেক ওপরে।

যাইহোক, বাঙালিরা মাছ খায়। এর কারণও আছে। নদীমাতৃক দেশ এই বাংলা। এই সকল নদী নালা জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তাই মাছ বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য। আবার ওই মাছ যদি ইলিশ মাছ হয় তবে তো কথাই নেই। কারণ মাছেদের মধ্যে ইলিশ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। এই ইলিশ মাছ খাওয়া বিষয়ে একটা রীতি আছে। এই রীতি পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত। প্রথাটি হচ্ছে দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর পর থেকে (কোথাও কোথাও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরদিন) থেকে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি অর্থাৎ সরস্বতী পূজার আগের দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। বাঙালি হিন্দুরা ইলিশ মাছকে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। বিজয়া দশমীর দিন যে ইলিশ খাওয়া বন্ধ হলো তা আবার শুরু করা হয় শ্রীপঞ্চমীর দিন। ওই দিন প্রথম জোড়া ইলিশ এনে বাড়ির মেয়েরা বা গৃহিণীরা মাছের উপর সিঁদুর দিয়ে নোড়া, ধানদূর্বা ও শুকনো পাট পাতা সমেত বরণ কুলায় স্থাপন করে। তারপর হুলুধ্বনি দিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং মাছ কুটে আঁশগুলোকে মাটিতে পুঁতে দেয়। পরে ওই মাছ না ভেজে রান্না করা হয়ে থাকে।

এবার দেখে নেওয়া যাক কেন এই

রীতি ও প্রথা চালু হয়েছিল, এর পেছনে যুক্তি ও বিজ্ঞান কী? স্বাদে ও গন্ধে ইলিশ মাছ সকলের প্রিয়। ভারতের প্রায় সর্বত্র ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মাছের স্বাদের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশ অত্যন্ত রসনাতৃপ্তিকর। ইলিশের মতো সুদৃশ্য মাছও খুব কম দেখা যায়। এছাড়া সদ্যোধৃত পদ্মার ইলিশে এক প্রকার গোলাপি এবং গঙ্গার ইলিশে সোনালি আভা দেখতে পাওয়া যায়।

ইলিশ সামুদ্রিক মাছ। সারা বছর ধরে এরা দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানে ভেসে ভেসে আহার্য সংগ্রহ করে। ডিম ছাড়বার সময় হলে তারা মোহনা দিয়ে বড় বড় নদীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে নদীর উজানের দিকে এগিয়ে যায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে কোনো অগভীর স্থানে অল্প মন্দীভূত স্রোতে স্ত্রীমাছ ডিম ছাড়ে। ডিম ফুটবার পর বাচ্চাগুলো প্রায় মাসখানেক ওই স্থানে থেকে একটু বড় হয় ও পরে নদীর প্রধান বা মূল স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পরে তারা আবার স্রোতের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সমুদ্রে পৌঁছায়। দু' বছরের মতো সমুদ্রে কাটিয়ে আবার ডিম দেওয়ার সময় হলে নদীর মধ্যে ফিরে আসে। ইলিশ মাছ বছরের অধিকাংশ সময়ে ডিম ছাড়লেও গঙ্গা ও পদ্মা নদীতে বর্ষাকালেই সর্বাধিক ডিম ছাড়ে। তাই বর্ষাশেষেই প্রচুর ইলিশের বাচ্চা যাকে জাটকা মাছ বলা হয় তা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ওই জাটকা মাছ অর্থাৎ বাচ্চা ইলিশগুলো ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং গভীর সমুদ্রে না গিয়ে নদীর মোহনা ও সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানে ঘুরে বেড়ায় ও খাদ্য অন্বেষণ করে। সেই জন্য বর্ষার পরে যদি যথেচ্ছ ইলিশের বাচ্চা নিধন করা হয় তা হলে ভবিষ্যতে এই মাছের প্রজন্ম বিলুপ্ত হবে আর আমরা আর ইলিশ খেতে বা চোখে দেখতে পারব না। তাই বিজয়া দশমী থেকে শ্রীপঞ্চমীর আগের দিন পর্যন্ত ইলিশ যদি ধর্মীয় কারণে মানুষ না খায় তবে তা ধরা থেকে জেলেরা বিরত হবে। পরিণামে ওই প্রজাতির মাছ রক্ষা পাবে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রতি বছর আমরা ইলিশ মাছ পেতে পারব।

কিন্তু অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা নিয়ম নীতি ভেঙে বছরের সব সময় যথেচ্ছ ইলিশমাছ খাচ্ছে। আর লোভে পড়ে জেলেরা ছোট বড় সবরকম মাছ ধরে বাজারে হাজির করছে। পরিণামে অচিরেই ইলিশের অস্তিত্ব লোপ পাবে। এই আশঙ্কায় বাংলাদেশ সরকার আইন প্রণয়ন করেছে যে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ অক্টোবরের মধ্যে যে কটি পূর্ণিমা পড়বে, তার আগে ও পরে পাঁচদিন করে মোট ১১ দিন ইলিশ ধরা যাবে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইলিশ যথেচ্ছ ধরার বিষয়ে বিধানসভায় বিল আনবার তোড়জোড় শুরু করেছে। মন্দের ভাল, দেরিতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোধোদয় হয়েছে। তবে আমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু বাঙালিদের অনুরোধ করব, তাঁরা অন্তত ইলিশ ভক্ষণের ধর্মীয় রীতিটা মান্য করুন, আইনে যাই বলা হোক না কেন। তাতে সকলের কল্যাণ হবে।

ঋণ স্বীকার :

১। ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত পরিষদ। ২। বর্তমান পত্রিকা। এবং ৩। অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমূহ।

দেশপ্রেমিক চারণকবি মুকুন্দদাস

রূপশ্রী দত্ত

মুকুন্দদাস একাধারে কবি, ব্যালাড-গায়ক, গীতিকার ছিলেন। গ্রামবাংলায় স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে মুকুন্দদাস অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতামহ ছিলেন নৌকাচালক। পিতা কাজ করতেন মুদির দোকানে।

মুকুন্দদাসের আদি নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁর পিতার নাম গুরুদয়াল দে ও মাতার নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী। ঢাকার বিক্রমপুরে বানারি গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা সপরিবারে বরিশালে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পিতা গুরুদয়াল সেখানে মুদির দোকান খুলেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভক্তিগীতি গাইতেন। বরিশালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বরিশাল কোর্টে উচ্চপদের চাকরি দেন।

পুত্র যজ্ঞেশ্বরেরও সুরেলা কণ্ঠ ছিল শৈশব থেকেই। শৈশব থেকেই তিনি গান লিখতেন ও গাইতেন। বরিশাল জেলা স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া তাঁর ভাল লাগত না। প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে খেলা করা তাঁর প্রিয় ছিল। তারপর ভর্তি হয়েছিলেন অশ্বিনী দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে। সেখানেও পড়াশোনা বেশি দূর এগোয়নি। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গানের মাধ্যমে সবাইকে দেশপ্রেমের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে বলেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর তখনকার বিখ্যাত কীর্তনগায়ক বীরেশ্বর দত্তের দলে যোগ দিয়েছিলেন। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি নিজের কীর্তনের দল গড়েছিলেন। তারপর দীক্ষা নেন রসানন্দ ঠাকুর কিংবা হরিবোলানন্দের কাছে। তিনিই শিষ্য যজ্ঞেশ্বরের নব নামকরণ করেন— মুকুন্দ দাস।

অশ্বিনীকুমারের নির্দেশমতো মুকুন্দদাস 'মাতৃপূজা' নাটক লিখে গ্রামেগঞ্জে দেশাত্মবোধ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলন এই নাটকের মূল কথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতজননীর মুক্তি এর ছত্রে ছত্রে। স্বদেশী থিয়েটার দল তিনি গড়েছিলেন। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বরিশালে ছিল তাঁর বিচরণ। তাঁর নাটক 'মাতৃপূজা'র খ্যাতি তৎকালীন বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছুকাল পর তাঁকে তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। গানের জন্যই মুকুন্দদাস স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভ্রাম্যমাণ স্বদেশপ্রেমের কবিরাই 'চারণকবি' নামে পরিচিত। এই অভিধা তাঁকে জনগণ শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করেছিল। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কিংবা ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী— তিনি যখন দরাজ কণ্ঠে গাইতে গাইতে পথযাত্রা করতেন, তখন জনগণ অভিভূত হতো। বিদেশি-নির্মিত-সাজসজ্জা, তাঁর গানের কথামতো, তৎকালীন বঙ্গনারীরা বর্জন করেছিলেন।

তাঁর লেখা নাটক 'পল্লীসেবা' 'ব্রহ্মচারিণী' 'সমাজ ও পথ' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলেও তাঁর উদাত্তকণ্ঠে গাওয়া উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান চিরকালীন। মুকুন্দদাস লোকান্তরিত হন ১৯৩৪ সালের ১৮ মে। মুকুন্দদাসের জীবনীচিত্রে নামভূমিকায় সার্থক রূপদান করেন বিখ্যাত অভিনেতা— নায়ক-গায়ক সবিতাব্রত দত্ত। দরাজ কণ্ঠের গানে ও গেরুয়া-আলখাল্লার যথোচিত রূপসজ্জায় সবিতাব্রত আসল মুকুন্দদাসকে যেন জীবন্তরূপে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন।

মেয়েরা দেশের লক্ষ্মী

সুতপা বসাক ভড়

মেয়ে এবং ছেলের মধ্যে কোনো তফাত নেই— বহু বছর ধরে এই কথা শুনে আসছি অথচ বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেকক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে। জীবনের অনেক পরীক্ষাতেই তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে। শুধুমাত্র মেয়েরাই নয়, বাড়ির মা-বৌরাও এই এটা প্রমাণ করছে। তাদের এই ভূমিকা অনুসরণযোগ্য। পৃথিবীর জনসংখ্যা সাড়ে সাতশো কোটি। এর মধ্যে অর্ধেক হলো মহিলারা, যাদের মধ্যে ১১০ কোটি হলো বালিকা এবং অল্পবয়েসি মেয়ে। এইসব মেয়ে শক্তির উৎস। বর্তমানে এমন ক্ষেত্র বিরল যেখানে মেয়েরা তাদের সুকর্মের নিদর্শন রাখেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তারা ডানা মেলে উড়ে গেছে উন্মুক্ত আকাশে— নিজেদের অবিরল কর্মের চিহ্ন রেখে দিয়েছে— জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র। তবে এখনও অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এখনও পৃথিবীতে ৭৫ কোটি মেয়েদের আঠেরো বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। গরিব দেশগুলিতে প্রতি তিনটি মেয়ের মধ্যে একজনের বিয়ে হয় কম বয়সে। প্রতি দশ মিনিটে বিশ্বের কোথাও না কোথাও হিংসার শিকার হয়ে একজন করে মেয়ে প্রাণ হারায়।

মেক দ্য চিল্ড্রেন নামক সংস্থার মতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রতি ১০০টি মেয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ১৪ জন মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করে। গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা কমে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে মাত্র একজন হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র ভারতে কেবলমাত্র ৩৩ শতাংশ মেয়েরা উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত যাবার সুযোগ পায়। ইউনিসেফের মতে বাংলাদেশের পরে সব থেকে বেশি

বাল্যবিবাহ হয় ভারতে। ২০১১-তে শহরাঞ্চলে ১০ থেকে ১৭ বছরের প্রত্যেক পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েদের ক্ষমতায়ণের পথে শিক্ষা সব থেকে বড় মাধ্যম। ইউনিসেফের মতে আফ্রিকা এবং এশিয়ার সব মেয়েরা যদি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায়, তাহলে সমগ্র বিশ্বে বাল্যবিবাহ ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়ে যাবে এবং আফ্রিকার সব মেয়েরা যদি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা যখন যুবতী হবে, তখন মাতৃত্ব সংক্রান্ত মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ পর্যন্ত কমে যাবে।

মেয়েরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হলেও সেখানে মেয়েদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেজন্য মেয়েদের প্রতি আমাদের মানসিকতা বদলানোর সময় এসেছে। আশার কথা, সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু হয়েছে। আজকের দিনে, অনেক মা-বাবাই মেয়েদের স্বাধীনতা ছাড়াও যথাসম্ভব সহযোগিতা করছেন। এইসব অভিভাবক অভিনন্দনের পাত্র, যাঁদের তত্ত্বাবধানে মেয়েরা পড়াশুনা করে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে দেখি হাজার হাজার মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়। সাংসারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের যোগ্যতার কোনো দাম দেওয়া হয় না। আমাদের সমাজব্যবস্থার বাস্তব সত্য হলো, সেখানে সোমঝোতা— পড়াশুনা বা কেরিয়ার উভয়ক্ষেত্রে মেয়েদেরই করতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও সামাজিক পরিবর্তন আশা জরুরি। মেয়েরা— মা, বোন, স্ত্রী বিভিন্নরূপে নিজেদের কর্তব্য নির্বাহ করে থাকে— সংসারে ভালবাসার উৎস হিসাবে নিজেদের বিলিয়ে দেয়, অথচ বাড়ির বাইরে তাদেরই অনেক সময় দুর্বৃত্তদের শিকার হতে হয়। পণপ্রথার মতো বীভৎস প্রথা এখনও সমাজে বিদ্যমান। যার ফলে আজও অনেক মেয়েকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। তবে, সুশিক্ষা সব সমস্যার সমাধানে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সেজন্য বাড়ির মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোশ করা উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, ‘‘যদি আপনি একজন পুরুষমানুষকে শিক্ষিত করেন, তবে কেবলমাত্র একজন মানুষ শিক্ষিত হয়, কিন্তু যদি আপনি একজন মহিলাকে শিক্ষিত করেন, তাহলে পুরো পরিবার শিক্ষিত হয়।’’ ■

বরিশাল ফিরোজপুরের রামকাটি আশ্রমের ব্যতিক্রমী দুর্গোৎসব

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারের দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও সংলগ্ন জেলা পুজোগুলির বাৎসরিক উদ্ভাবনী চমক এড়িয়ে সুযোগ এসে গেল প্রতিবেশী বাংলাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত একটি অঞ্চলের পুজোয় যোগ দেওয়ার। বাংলাদেশের বরিশাল ডিভিশনের ফিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার অন্তর্গত শ্রীরামকাটি অঞ্চলের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভাময় পুরুষোত্তম মঠে এই পুজো উৎসবের সঙ্গে চলেছে প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজ। কঠিন এই সাধনা তা তো আর বলে দিতে হয় না। একে মঠের থেকে তপোবন বললে সকলের ধারণা পেতে সুবিধে হবে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন এই আশ্রমের পরিচালক শ্রীকুমার আচার্য। তদানীন্তন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব প্রয়াত চিত্ত সুতারের সঙ্গে কলকাতায় থেকে তিনি মুক্তি যুদ্ধের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। এই একই সময়ে তিনি আমৃত্যু হিন্দু-শুভাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধরের সংস্পর্শে এসে পড়েন। এই যুগ্ম ব্যক্তিত্বের যোগাযোগে ও তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিজ বাসভূমি সংলগ্ন আশ্রমটিকে (১৯৬৮) তিনি তিলে তিলে গড়ে তোলেন। এখানে খুবই অল্প বয়স থেকে ছেলেরা, বর্তমানে কিছু সংখ্যায় মেয়েরাও স্বামীজীর পরিচালনায় নিজেদের গড়ে তুলছে। অনেকেই স্থানীয় স্কুল কলেজে পড়ে। শিক্ষা সমাপনান্তে জীবিকার প্রয়োজনে আশ্রমের বাইরে যেতে বাধ্য হলেও এখানকার টান তারা অনেকেই এড়াতে পারেন না। এসে জড়ো হন পুজোর সময়। এই আশ্রমে কোনো একক পূজারি কিন্তু পুজা অর্চনা করলেন না। স্বামীজী-দীক্ষিত পাঁচজন নিষ্ঠাবান তরুণ যাদের সকলেরই উপবীত রয়েছে তারাই পর্যায়ক্রমে পূজার কাজ করল। পুজোর মন্ত্রগুলির অত্যন্ত সহজবোধ্য ও সুমধুর বাংলা অনুবাদ করেছেন স্বামীজী স্বয়ং। তিনি নিজে সুলেখক ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। মানুষ দেবীকে কী মন্ত্রে আহ্বান করল তা সে সহজেই বুঝতে পারল। এই মন্ত্রগুলি হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিবিড় আন্তরিকতায় চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নীরবে বিপুল পরিশ্রমে স্বামীজীর যোগ্য সহকারী হিসেবে এ কাজ করছেন দীক্ষিত ব্রহ্মচারী কুমার বিজয়ব্রত বা বিধান। স্বামীজীর সজাগ দৃষ্টিতে

রামকাটি আশ্রমের দুর্গাপূজা।

মাতৃমূর্তির উদ্দেশে নিবেদিত হল। নিজ কানে মন্ত্রোচ্চারণ শুনলে পুজারির সঙ্গে সাধারণ ভক্তজনও অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। এটিই হিন্দু ভক্তিভাব পরম্পরার যথাযথ সংরক্ষণ। সন্ধ্যারতির সময়ও প্রচলিত নিয়ম ভাঙার পালা। আশ্রমের আশ্রমিকরা ছাড়াও স্থানীয় মেয়েরাও কী সহজ অনাড়ম্বরভাবে দেবীর আরতিতে অংশ নিল। পুষ্প, জল, শঙ্খ, পাখা, দীপ, ধুনো ইত্যাদি দিয়ে দেবীকে আরতি করার যে রীতি তা সবই মেয়েরা নাচের আর ঢাকের তালে তাল মিলিয়ে দেখাল। চোখ জুড়োনো ভঙ্গিতে ছিল তাঁদের নিবেদন। তুমুল কাঁসর ঘণ্টার যোগদানে ছিল ছেলেরা। প্রত্যেকের পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলী। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তারা এই পোশাক কখনও বর্জন করেনি।

আশ্রমের যে বিপুল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ চার চারটি পুকুর যার এক একটিতে এক এক ধরনের মাছের চাষ হয়। হাঁস, খরগোস, কুকুর, পুষ্পলতা থেকে বৃক্ষরাজি সকলেই আশ্রমিকদের সর্বসময়ের সঙ্গী হিসেবে সহাবস্থান করছে। তাদের প্রতি মমতা মানুষের

পুজার প্রাচীন প্রথা ও আচারগুলিতে ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কঠিন। এখানে মাতৃমূর্তি বিসর্জিত হয় না। কেবল ঘটই জলে যায়। এর পরই আরও একটি চমৎকার পুরানো রীতির পুনরুদ্ধার করেছেন স্বামীজী। পুরোহিত থেকে পাচক, অংশগ্রহণকারী কিশোরী থেকে পূজার উপাচার তৈরিতে সকলকেই মাত্রাভেদে একটি দক্ষিণা প্রদান করা হয়। বিসর্জনের পর এই অনুষ্ঠানে একে একে তাদের কপালে তিলক পরিয়ে হাতে সসম্মানে নির্দিষ্ট অর্থ, প্রবীণাদের ক্ষেত্রে শাড়ি দেওয়া হল কোনো করতালি ছাড়াই। দক্ষিণাটিকে কখনই শুধুমাত্র অর্থপ্রাপ্তির নিরিখে দেখা হয়নি। এটি ছিল সর্বাংশেই অংশগ্রহণকারীদের সাম্মানিক। এই কাজটি করেছিলেন স্বামীজীর নির্দেশে আশ্রমের দীর্ঘদিনের পৃষ্ঠপোষক ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলের 'মা' আমাদের শ্রদ্ধেয়া মহুয়াদি (মহুয়া ধর, প্রয়াত ডাক্তার সুজিত ধরের স্ত্রী)। দক্ষিণান্তে সকলেই ভক্তিভরে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করার যে ভারতীয় রীতি তার পূর্ণ প্রকাশ দেখাল।

অষ্টমীর দিন ছিল পূর্ব বাংলার নদীনালা,

খালবিল বেষ্টিত বিশেষ করে বরিশাল প্রখণ্ডে যা ছিল নির্জনতার কবি জীবনানন্দের জন্মস্থান---আমৃত্যু স্বপ্ন কল্পনায় সেই শ্রীরামকাটি অঞ্চলের খাল ভেঙে কালীগঙ্গা থেকে পুজোর জল আনার এক মনোমুগ্ধকর পর্ব। ট্রলারের ওপর ছেলে-মেয়ের দল ধুপ, দীপ, ধুনুচি, চামর ঘণ্টা নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার জনপথ পাড়ি দিয়ে তিন নদীর মোহানা থেকে নিয়ে এল পবিত্র জল। এই জলযাত্রাটি চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে হিন্দুভাবাবেগ যে দেশ কাল ও পরিস্থিতির বাস্তবতাকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে তা বোঝা যাবে না। শাঁখ ও মামুলি কাঁসর ঘণ্টার ডাকে নদী সদৃশ খালটির দু'পাশে বৌ, ঝি, ছোট ছেলেমেয়েদের দৌড় ভোলা যায় না। তারা এ উৎসবের শরিক হতে উদগ্রীব।

কিন্তু উপচে পড়া ভাবাবেগের মধ্যে অন্তঃসলিলা বয়ে চলেছে উদ্বেগের স্রোত। পুজোর ক'দিন ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, সাধারণ মানুষ থেকে একাধিক পুলিশ কর্তা পর্যায়ক্রমে আশ্রমে ঘুরে গেছেন। পুজোর দিনগুলিতে অষ্টপ্রহর ছিল আনসার নামে রক্ষীবাহিনী। এই আইনরক্ষকদের বাহ্যিক আলাপ কখনই আশঙ্কার জন্ম দেয় না। কিন্তু অভ্যন্তরের ছবিটা হয়তো গোলমেলে অনেকটাই মোড়কের ক্যাপসুলের মতো, তা ধরা পড়ে সংখ্যালঘু হিন্দু হিসেবে আশ্রম পরিচালক স্বামীজীর কথাবার্তায়। বোঝা যায় কী প্রখর প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁর নিত্য সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী হিসেবে হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কে হতাশ স্বামীজী দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি যুবক আশ্রমিকদের সদা ওয়াকিবহাল করে রাখনে। হিন্দুধর্মের সনাতনী প্রথা ও ভারতবর্ষের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তারা সদা অবহিত। এতটা রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক সচেতনতা তারা যে স্বামীজীর কাছেই পেয়েছে তা তারা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকারও করে। তাদের সৎ ব্যবহার, আন্তরিকতা ও হিন্দুত্বে অটল বিশ্বাস যেকোনো হিন্দুরই ঈর্ষার বিষয়।

শুধু পুজো করেই তো শেষ হয় না। আশ্রম অধিকর্তার দায়িত্বের দায়ভার স্বেচ্ছায় সামগ্রিক। এখানকার হিন্দু সমাজকে এক বন্ধনে রাখতে ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সহমর্মিতার উন্মেষ ঘটাতে তিনি ত্রৈমাসিক 'অন্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিয়মিত হিন্দু-মুসলমান বিদ্বজ্জনদের নিয়ে সারা বছর আয়োজন করেন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাসভার। পোশাকী নামটি ভারী সুন্দর 'সুজন সমাবেশ'। এখানে সম্প্রদায় ভাবনা, বহির্জীবন-অন্তর্জীবন, সমাজে সজ্জনের দয়া, সেবাধর্মী দেশপ্রেম এমন নানান বিষয়ের মাধ্যমে নিজেদের তো বটেই অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও খানিক হলেও প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

এছাড়া আশ্রমে বছরের বিভিন্ন সময় চলে সনাতনী আচার, অনেক স্থানেই যা হারিয়ে গেছে। (১) পৌষ মাসে উত্তরায়ণ যজ্ঞানুষ্ঠান, (২) কিশোরদের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী নিয়ে চর্চা, এগুলি তিনি অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার মানুষদের মধ্যেও করে থাকেন। (৩) বয়স নির্বিশেষে উপনয়ন দিয়ে কিশোরদের সনাতন ব্রাহ্মণ্যগুণাধিকারী করা। যথার্থ গুরুকুল শিক্ষার সঙ্গে আশ্রমে চিরচারিত শীতলাপূজা, গুরুপূর্ণিমা, হরিনামকীর্তন, জল জঙ্গলের নিরাপত্তার অভিলাষী মনসা পূজা থেকে সত্যনারায়ণ পূজা সবই হয়।

স্বামীজীর কর্মকাণ্ড বহুধা বিস্তৃত। অনেকাংশেই বৈরী পরিবেশের মধ্যে তিনি যে সর্বত্যাগী হয়ে হিন্দুদের একত্রিত ও স্বধর্মে নিষ্ঠা রাখার সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের সহমর্মিতা অর্জনেও অনেকাংশে সফল তা বোঝা যায় বিজয়াদশমীর দিন। তাঁর আমন্ত্রণে আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেওয়া হিন্দুদের সঙ্গে সুশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বিচিত্র পেশার সংখ্যাগুরু সমাজের একই পঙ্‌ক্তি-ভোজনে অংশ নেওয়ার ঘটনায়। সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে যায়। এতে স্বামীজী নিঃস্বার্থ আনন্দ পান।

বিজয়াদশমী হয়ে গেল! একদিন স্বামীজী তার যাবতীয় কাজে মহুয়াদির যোগ্য সহযোগিতা আশা করেছেন এবং তা সর্বাংশেই পেয়েছেন। রামকাটি আশ্রমের সকলেই এই সর্বজন শ্রদ্ধেয়াকে লক্ষ্মীপুজো অবধি রেখে দেবে।

এই অভূতপূর্ব কর্মনিষ্ঠার অভিজ্ঞতা সঙ্গী করে আমি চললাম পদ্মাপারের ধলেশ্বরী, মুন্সীগঞ্জ, বুড়িগঙ্গার রোমান্টিক পথে ঢাকায়। অতিথি বৎসল শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীজী ও তাঁর শিষ্যরা আমার যাত্রা নিরাপদ রাখতে সবরকম সাহায্য করলেন। এ নিখাত স্মৃতি, আক্ষরিক অর্থেই এক জীবনের। আর তার প্রধান প্রশ্রয়দাত্রী আমার দিদি শ্রীমতী মহুয়া ধর।

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে।

এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

খালি পেটে কী কী খাবেন না

ডাঃ রিংকী ব্যানার্জী

সবসময়েই চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা বলেন, প্রতিটি খাবার খাওয়ারই কিছু নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিছু খাবার যেমন একদম খালি পেটে খাওয়া যায়, তেমনি আবার এমন কিছু আবার রয়েছে যা খালি পেটে খেলে বিপত্তির একশেষ। এখানে খালি পেট বলতে শুধু সকালে উঠে খাবারের কথা বলা হচ্ছে না, অনেকক্ষণ আগে কোনও খাবার খেয়ে নেওয়ার পরও যদি পেট খালি হয়ে যায়, তাহলেও হাতের নাগালে যা পাবেন, সেসব খাবার খেয়ে নেওয়া উচিত নয়। কেননা অনেক খাবারই এমন রয়েছে, যা খালি পেটে খেলে গ্যাস আর অ্যাসিডিটির সমস্যায় জেরবার হতে হয় পরে। সুতরাং যা খাবেন ঠিকমতো জেনে বুঝে ভেবেচিন্তে খাবেন। দেখে নেওয়া যাক খালি পেটে কোন কোন খাবার খাবেন না—

অতিরিক্ত তেলমশলা ও মরিচ যুক্ত খাবার : অতিরিক্ত ঝাল, তেল, মশলা কিংবা কাঁচামরিচ দিয়ে যেসব কষানো খাবার তৈরি হয়, সেগুলো কখনই খালিপেটে খাওয়া উচিত নয়। কেননা এই খাবারগুলো এমনিতেই গুরুপাক। খালি পেটে খেলে অন্ত্রে গিয়ে হজম হতে প্রচুর সময় নেয়। যার ফলে সর্বক্ষণ পেটে একটা ভারী ভারী ভাব, অম্বল, পেটফাঁপা ইত্যাদি সমস্যা হয়।

কার্বোনেটেড পানীয় : বুঝতেই পারছেন কালো, সাদা, কমলা বিভিন্ন সফট ড্রিঙ্কসের কথা বলছি। খালি পেটে এই ধরনের ড্রিঙ্কস বা কোলড্রিঙ্কস একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। কেননা এতে মজুত প্রচুর পরিমাণে কার্বোনেটেড অ্যাসিড, যা পাকস্থলীতে অন্যান্য অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে গা বমি ভাব, অম্বল, গ্যাস ইত্যাদি সমস্যা তৈরি করে।

শর্করাজাতীয় খাবার : যেসব খাবারে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি সেই সকল খাবার বা পানীয় খালি পেটে খাওয়া একদম অনুচিত। কেননা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্যানক্রিয়াস। অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠে খালিপেটে এক গ্লাস ফলের রস খান, এটা একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কেউ কেউ আবার প্রাতঃরাশে খালি পেটে খেয়ে নেয় বাটিভর্তি ফল। এর মধ্যে মিষ্টি জাতীয় ফল থাকলে তা থেকে দ্রুত যেমন ক্যালোরি বাড়ার সমস্যা থাকবে, তেমনি অপেক্ষাকৃত কম ফল

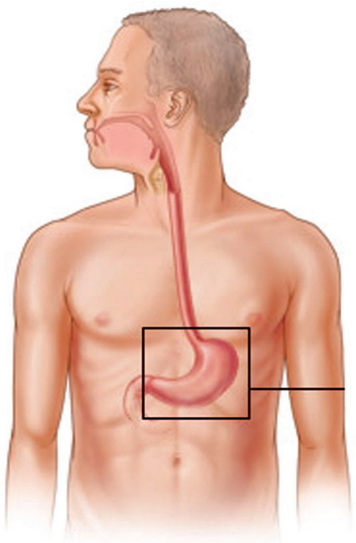

থেকে হতে পারে অ্যাসিডিটির সমস্যা।

বরফ ঠাণ্ডা পানীয় : আমাদের অনেকেরই অভ্যেস রয়েছে গরমকালে বাইরে থেকে এসেই ফ্রিজ খুলে বোতল বের করে ঢক ঢক করে খেয়ে নেওয়া। খালি পেটে খুব ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া পানীয় পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। এতে নাক, মুখ ও খাদ্যনালীর মধ্যে থাকা আর্দ্র ত্বকের আবরণের ক্ষতি হয়। যার ফলে ব্যাঘাত ঘটে হজমক্ষমতায়।

সাইট্রাস জাতীয় ফল : খালি পেটে কখনও সাইট্রাস জাতীয় ফল যেমন মুসুম্বি বা কমলালেবু খাবেন না, এতে উপকার তো হবেই না, উল্টে অ্যাসিটির সমস্যায় আপনি হবেন কুপোকাত।

কাঁচা সবজি ও স্যালাড : অনেকেই কাঁচা পেঁয়াজ, টমেটো খান কিংবা খালি পেটে। কখনও এমনটা করবেন না। এমনকী পেট খালি থাকা অবস্থায় কখনওই পুষ্টিকর বলে একবাটি স্যালাড খেয়ে বসবেন না। তাতে পাকস্থলীর উপর অযথা চাপ পড়ে।

কফি : সেই একই কারণ, খালি পেটে কফি খাওয়া মানে অ্যাসিডিটির সমস্যাকে ডেকে আনা। যদিও কফি খাওয়ার পর পেট ভর্তি থাকার একটা অনুভূতি থাকে, তবে তা সাময়িক।

মনে রাখুন আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

● অনেকেই খালি পেটে লেবুর রস খান, এটা করবেন না। তবে লেবুর জল হলে ব্যাপারটা আলাদা। অনেকেরই অভ্যেস রয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে গরম জলে লেবু আর মধু মিশিয়ে খাওয়া। এর ফলে হজম প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। পরিপাকতন্ত্রের ক্রিয়াও স্বাভাবিক থাকে।

● মনে রাখবেন শরীরে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি ১২ ও ভিটামিন ডি থাকে, তখন অ্যাসিডিটি চট করে শরীরে থাবা বসায় না। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক ভিটামিন দুটির অভাবে শরীরের হজমক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়ে অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়। তাই খেয়াল রাখবেন, খাবারে যেন অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানের অভাব না হয়।

● শশা খালি পেটে খাওয়া যায়। কেননা শশা হজমে সাহায্য করে, কিন্তু ভুলেও সকালে উঠে খালি পেটে টমেটো খাবেন না।

● ভুলক্রমেও খালি পেটে ডাবের জল পান করবেন না। এতে অ্যাসিডিটি হয়ে শরীর ভীষণ খারাপ হতে পারে। তার বদলে তরমুজের রস খান। ■

।। একটি আবেদন ।।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং গৃহী কার্যকর্তা, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকার্য বিস্তারলাভ করেছে, তাঁদের স্মরণে '**ওদের আমরা ভুলিনি**' শীর্ষক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। সেই মহাপ্রাণদের যাঁরা সান্নিধ্যলাভ করেছেন তাদের অনুভব-কথন লিখে স্বস্তিকা পত্রিকার ঠিকানায় আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ কোন পথে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ হকির শিরোপা মাথায় তুলে ভারতীয় হকি দল প্রমাণ করেছে এশিয় পর্যায়ে তারা একমেবাদ্বিতীয়ম্। এশিয়ান গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ, এশিয়া কাপ-মহাদেশীয় পর্যায়ে সব খেতাব এখন দিল্লির হকি ইন্ডিয়া ক্যাবিনেটে। কিন্তু এশিয়ার বাইরে গেলে কী যে হয়, সেই গোলকধাঁধার উত্তর কে দেবে। সারা বছর প্রদর্শনী বা টেস্ট সিরিজে ইউরোপীয় দলগুলিকে হারাতে পারে ভারতীয়রা কিন্তু বিশ্ব পর্যায়ের টুর্নামেন্টে নামলেই নেদারল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি,

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ হকি চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় হকি দল।

বেলজিয়াম বা অন্য গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া টেক্কা মেরে বেরিয়ে যায়। গত বছর লন্ডনে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ওঠা ছাড়া বিশ্বমানের কোনো টুর্নামেন্টে ভারতের বলার মতো সাফল্য নেই। ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব হকি লিগের খেলা। দুনিয়ায় সেরা দশটি দল খেলবে। ওই টুর্নামেন্টেই হবে আগামী বছর একই সময়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ হকির স্টেজ রিহার্সাল।

এশিয়া কাপে সিনিয়র-জুনিয়র কম্বিনেশনে দল পাঠিয়েছিল হকি ইন্ডিয়া। রোনান্ট অন্টম্যান চলে যাওয়ার পর তারই স্বদেশীয় ডাচ মহিলা দলের প্রাক্তন কোচ শোয়ার্ড মারিনের কাছেও ছিল এশিয়া কাপ অগ্নিপরীক্ষার। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উতরে গেছেন মারিন। সনাতন ধ্রপদী হকির গরিমা ফিরিয়ে আনার কাজে অনেকটাই সফল তিনি। যে নান্দনিক অথচ আক্রমণাত্মক হকির জন্য ভারতের খ্যাতি ছিল ভুবনবিদিত সেই ঘরানার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রেসিং স্টাইলের সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতের খেলাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মারিন। এতে চিরাচরিত দুর্বলতা অর্থাৎ শর্ট কর্নারের প্রয়োগ মুনশিয়ানায় চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারত। আর তার এই স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্স কতটা ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার পাওয়ার হকির সঙ্গে লড়তে পারে সেটার দিকেই লক্ষ্য থাকবে ভারতীয় হকিপ্রেমীদের। কারণ গত কয়েকবছর ধরে এশিয়ার সব শক্তিশালী দলকে ভারত বলে বলে হারাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বসেরা দলগুলির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। অন্তত সর্বোচ্চ স্তরে সেমিফাইনাল পর্যায়ে নিয়মিত না খেললে প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না সর্দার সিংহদের।

ব্যাডমিন্টনে কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সব টুর্নামেন্টে কোনো না কোনও ভারতীয় ফাইনাল, নিদেনপক্ষে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলছেন। এবছর চারটি সুপার সিরিজ ফাইনাল খেকে তিনটে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। সম্প্রতি ডেনমার্ক ওপেন জিতেছেন পরপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া ওপেনেও বিশ্বের তিন সেরা খেলোয়াড়কে হারিয়েছেন। এইচ এস প্রণয়ও মাঝে মধ্যেই শীর্ষ র‍্যাঙ্কিং খেলোয়াড়কে জমি ধরিয়ে দিচ্ছেন।

মেয়েদের মধ্যে সাইনা নেওয়াল ও পিভি সিন্ধু আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে সম্ভ্রমের আসনে রয়েছেন। বহু টুর্নামেন্ট জিতেছেন দুজনে। শুধু বিশ্ব খেতাব জেতা বাকি। দুজনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রানারআপ হয়েছেন, ট্রফি জেতার মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। জুনিয়র পর্যায়ে লক্ষ্য সেন ও ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের গুরু গোপিচাঁদের সুকৃতি কন্যা গায়ত্রী দ্রুতবেগে উঠে আসছেন। অচিরেই সিনিয়র পর্যায়ে চলে এসে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ঐতিহ্য ও গৌরব বহন করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবেন বলে প্রাক্তন বিশ্বসেরা প্রকাশ পাড়ুকোনের ধারণা।

দিল্লিতে হয়ে যাওয়া বিশ্ব স্বীকৃত এক বড় মাপের শুটিং প্রতিযোগিতায় জিতু রাই ও হিনা সিধু সোনা জিতে প্রতিভা ও আস্থার প্রতি সুবিচার করেছেন। একাধিক গ্রাঁপ্রি টুর্নামেন্টে এই দুই শুটার সাম্প্রতিককালে সাফল্যের শিখরে উঠেছেন কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকটা হকিটিমের মত। বিশ্ব খেতাব না জিতলে শুটিংয়ের হল অব ফেমে স্থান পাবেন না। তবে হিনা জিতু দুজনেই যথেষ্ট দক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নক্ষত্র হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ■

ডাঃ জিতেন্দ্র চতুর্বেদী
বেগার শ্রমিকদের ভগবান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'আমার তখন পাঁচবছর বয়েস। অভাবের সঙ্গে লড়ার শক্তি তখন আমার ছিল না। আমার মা নিরক্ষর। তিনটে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে মা গোয়ালঘরে থাকতেন। তার ঘুম ভাঙত রাত তিনটের সময়। তারপর সারাদিন কেটে যেত কয়েকটা আলুর খোঁজে, সেদ্ধ করে যা তিনি আমাদের মুখে তুলে দেবেন।' কথাগুলো ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট, সংক্ষেপে দেহাতের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জিতেন্দ্র চতুর্বেদীর।

দেহাত প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ডাঃ চতুর্বেদীর একটা বিশ্বাস। যে সমাজ শিশুদের নিরাপত্তা, সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে না তার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। সে সময় উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর গ্রামে তাদের পরিবার অন্যতম সচ্ছল পরিবার হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু পারিবারিক মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে একদিন ডাঃ চতুর্বেদীর বাবা গৃহত্যাগ করলেন। নিরক্ষর মা সন্তানদের নিয়ে বাড়ির গোয়ালঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। জানতেও পারলেন না, ১৯৭৬ সালে ১৩ জানুয়ারি বাড়ি ফিরে আসার আগে পর্যন্ত— তিন বছর ধরে স্বামী তাঁর নামে প্রতিমাসে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে টাকা তাকে না দিয়ে আত্মসাৎ করেছে অন্য কেউ। এই তিন বছর অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে কেটেছে।

১৯৯০ সালে জিতেন্দ্র চতুর্বেদী বিএইচএসএস (ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি) পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু টাকা রোজগারের দৌড়ে না নেমে তিনি উত্তরপ্রদেশের বাহ্‌রাইচ জেলার জঙ্গলাকীর্ণ প্রত্যন্ত গ্রাম বিথিয়ায় চলে যান চিকিৎসা করবেন বলে। থাকতেন একটা কুঁড়ে ঘরে। একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা তিনি লক্ষ্য করলেন। দেখলেন গ্রামের একদল লোক জঙ্গলে 'বেগার' খাটতে যাচ্ছে। বেগার এক ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম। যখন দেশে মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়নি তখন থেকে এই প্রথা চলে আসছে। উল্লেখ্য, মুদ্রাব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে পণ্য কেনবেচা হতো। সেই সময় শ্রমিকও ছিল বিনিময়যোগ্য পণ্য।

১৯৫০ সালে আইন করে এই বেগারপ্রথা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু গরিব গ্রামবাসীরা সেই আইন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। জিতেন্দ্র প্রাথমিক ভাবে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলার

অন্য রকম

চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি। কারণ বেগার-প্রভুদের ভয়। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবার ভয় তো আছেই, সেইসঙ্গে রয়েছে প্রাণসংশয়। গ্রামের মেঠো ঝোপঝাড়ে দু'-পাঁচটা লাশ পড়ে থাকা বিথিয়ায় কোনও ব্যাপারই নয়।

কৌশল বদলালেন জিতেন্দ্র। খানিকটা জমি পরিষ্কার করে সেখানে ভলিবল খেলার কোর্ট বানালেন। এতে কাজ হলো। প্রথমে এগিয়ে এল যুবকেরা। জিতেন্দ্র জানতে পারলেন তারা এই বেগার প্রথাকে ঘৃণা করে। কিন্তু বিনামূল্যে শ্রম না দিলে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা তাদের ওপর জুলুম শুরু করবে। আশেপাশের পাঁচটি গ্রামে খোঁজখবর নিয়ে জিতেন্দ্র দেখলেন পরিস্থিতি সর্বত্র এক। স্বাধীনতার পর রাজ্যের ভূমি রাজস্ব দপ্তর যে মানচিত্র তৈরি করেছিল তাতে এইসব গ্রামের কোনও উল্লেখই নেই। অর্থাৎ এখানে যাঁরা থাকেন তারা দেশের নাগরিক নয়, উদ্বাস্তু। সুতরাং এদের যতখুশি বেগার খাটাও এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা টাকা কমিশন পকেটে পোরো।

জিতেন্দ্র তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন। তার জনসমর্থন বাড়ছিল। এই সময় একটি এনজিও বাহ্‌রাইচে যায়। তারা চেয়েছিল জিতেন্দ্র তাদের কাজকর্মের দায়িত্ব নিন। কিন্তু জিতেন্দ্র তখন নিজের সংস্থা তৈরি করার লক্ষে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। ২০০৬ সালে তিনি শুরু করলেন স্বাবলম্বন এবং ফসলের (ফারমারস অ্যাকশন ফর সাসটেনেবল অ্যাগরো-চেসড লাইভলিহুডস) মতো কর্মসূচি। যার উদ্দেশ্য বেগার শ্রমিকদের কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে উন্নীত করা। সে কাজে তিনি অনেকটাই সফল। ২০০৬ সালে অরণ্য অধিকার আইন পাশ হলো। অরণ্যবাসী জনজাতিদের স্বীকৃতি দিল দেশ। তার থেকেও বড়ো কথা উত্তর প্রদেশের ভূমিরাজস্ব দপ্তরের রেকর্ডে স্থান পেল বাহ্‌রাইচ জেলার সাতটি গ্রাম। এর থেকে বড়ো পাওয়া নিজভূমে পরবাসীদের আর কীই বা হতে পারে। ■

বাজীরাওয়ের বলিদান

পশ্চিমঘাট পর্বতের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শিবা। ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার চালানোর তার জুড়ি মেলা ভার। পাহাড় জঙ্গলে বসবাস করা ছেলেরা শিবার বন্ধু। তারা যেমন সাহসী, তেমনি বিশ্বাসী। এই পাহাড়ি বন্ধুদের নেতা শিবা। সবাই ডাকে শিবাজী বলে।

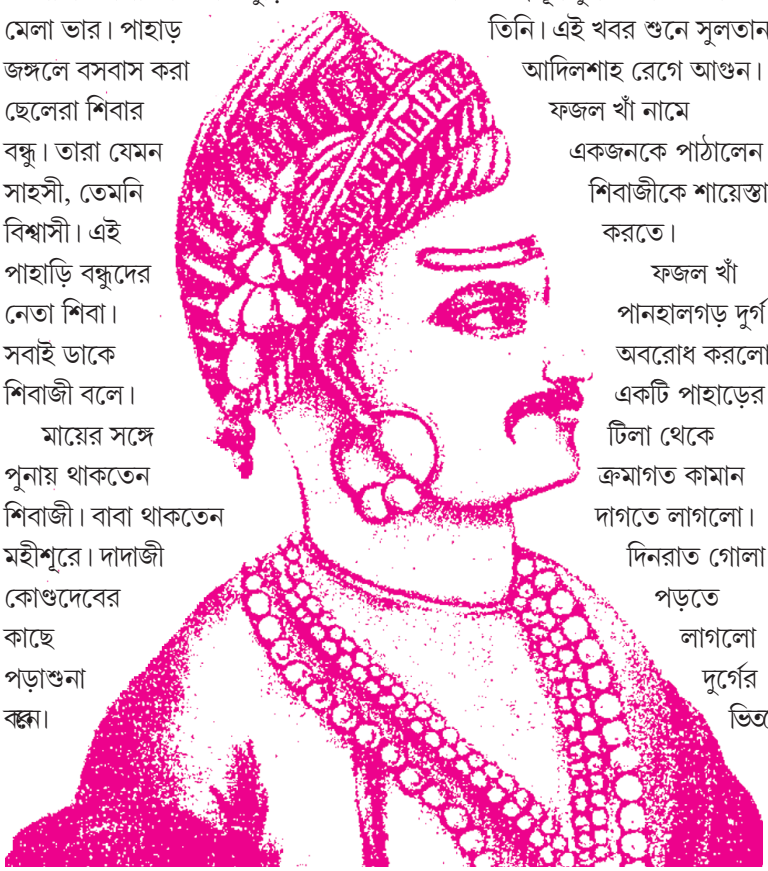

মায়ের সঙ্গে পুনায় থাকতেন শিবাজী। বাবা থাকতেন মহীশূরে। দাদাজী কোণ্ডদেবের কাছে পড়াশুনা করেন। শুনতে ভালোবাসেন রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি। কথক ঠাকুরের মুখে শুনতেন— কত সমৃদ্ধ ছিল এই দেশ। তারপর বিদেশিদের আক্রমণে সব কেমন শ্মশান হয়ে গেল। শুনে শিবাজীর চোখ জ্বলে উঠতো। ভাবতেন কবে বিদেশি শত্রুরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। মনে মনে ঠিক করেন— আবার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই পাহাড়ি তরতাজা ছেলেদের নিয়ে শিবাজী তৈরি করলেন সেনাবাহিনী। দখল করে নিলেন বিজাপুর সুলতানের একের পর এক দুর্গ। সুলতানকে আরও বেশি জব্দ করতে পানহালগড় নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করলেন তিনি। এই খবর শুনে সুলতান আদিলশাহ রেগে আগুন। ফজল খাঁ নামে একজনকে পাঠালেন শিবাজীকে শায়েস্তা করতে।

ফজল খাঁ পানহালগড় দুর্গ অবরোধ করলো। একটি পাহাড়ের টিলা থেকে ক্রমাগত কামান দাগতে লাগলো। দিনরাত গোলা পড়তে লাগলো দুর্গের ভিতরে। শিবাজী দুর্গের বুরুজের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, নিদারুণ বিপদের মধ্যে পড়েছে তারা। পালাবার সব পথ বন্ধ। শিবাজী প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন। তানাজী, বাজীরাও, যেসাজী প্রমুখ বন্ধু যোদ্ধাদের নিয়ে বৈঠক করলেন তিনি। এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিলেন সেই বৈঠকে।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদের রাত। বিজাপুরি সৈন্যশিবিরে আহারাদি সমাপ্ত হয়েছে। সবাই একটু বিশ্রামের জোগাড় করছে। ঠিক এমন সময় পানহালগড় দুর্গের দ্বার খুলে গেল। হাজার খানেক সৈন্য নিয়ে শিবাজী ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিজাপুরি সৈন্যদের উপর। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল বোঝা গেল না। যুদ্ধ হলো, বিজাপুরি সৈন্য ছিন্নভিন্ন হলো। রাত শেষ হয়ে আসে। শিবাজী তখন ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বিশালগড় দুর্গের দিকে। সামনে তখনও অনেক পথ বাকি। পেছনে এগিয়ে আসছে বিজাপুরি সেনা। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে বিশালগড়ে।

গজপুর নামে একটি জায়গায় এসে শিবাজী দাঁড়িয়ে পড়লেন। জায়গাটির দুদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে সরু পথ। মাত্র দুজন সৈন্য পাশাপাশি ঘোড়া নিয়ে যেতে পারে। শিবাজী দেখলেন এই পথ যদি রোধ করে দাঁড়ানো যায় তাহলে বিজাপুরি সৈন্যকে বাধা দেওয়া যায়। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত।

এগিয়ে এলেন বাজীরাও। বললেন— এ অঞ্চল আমার চেনা। কয়েকজন সৈন্য নিয়ে আমি বিজাপুরি সৈন্যদের এখানে আটকে রাখবো। ততক্ষণে আপনি পৌঁছে যাবেন বিশালগড়ে। সেখানে পৌঁছে কামানের তোপ দাগলেই আমি বুঝতে পারবো আপনি নিরাপদে পৌঁছে গেছেন।

শিবাজী এই প্রস্তাবে প্রথমে তিনি সম্মত হলেন না। প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। বাজীরাও বললেন— আপনি বেঁচে থাকলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। শিবাজী সজল চোখে বাজীরাওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ঘোড়া ছোটালেন বিশালগড়ের

দিকে।

রাতের শেষ প্রহর। বিজাপুরি সৈন্যদল গজপুরের গিরিপথের মুখে এসে থমকে গেল। খোলা তরবারি হাতে যমের মতো গিরিপথের মুখ আগলে আছে বাজীরাও এবং তার সৈন্যরা। বিজাপুরি সৈন্যরা বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো বাজীরাওয়ের উপর। তরবারি হাতে লড়াই করতে লাগলো বাজীরাও। ভোর হয়ে এলো, আলো ফুটছে। কিন্তু তখনো লড়াই করে যাচ্ছে বাজীরাও।

এদিকে শিবাজী এগিয়ে চলেছেন বিশালগড়ের দিকে। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশালগড়ের দুর্গচূড়া। অবশেষে তিনি পৌঁছলেন বিশালগড়ে। তখনও চলছে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বড় কঠিন। অস্ত্রের আঘাতে রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাজীরাওয়ের সারা দেহ। টানা পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ করছেন তিনি। কিন্তু বিশালগড় থেকে তখনো কোনো তোপের আওয়াজ আসেনি। তবে কী শিবাজী বিশালগড়ে পৌঁছতে পারেননি। নাকি অন্যপথে বিজাপুরি সৈন্য তাকে বন্দি করেছে! আর কিছু ভাবতে পারেননি বীর বাজীরাও। তবে কী ব্যর্থ হবে হিন্দু রাজ্যের স্বপ্ন? অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। আর তখনি শোনা গেল বিশালগড়ের তোপধ্বনি। বাজীরাওয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। শিবাজী পৌঁছে গেছেন বিশালগড়ে।

সংগৃহীত

এসো সংস্কৃত শিখি

প্রমাদবশাত্ সংবৃত্তম্, ন তু বুদ্ধ্যা।
ভুল করে হয়েছে, জেনেবুঝে হয়নি।
অয়ম্ এক: শনি:।
এ একজন দুষ্ট।
ভবদুক্তং সর্বম্ অপি অঙ্গীকর্তুং ন শক্যম্।
তোমার কথা পুরোটাই মানতে পারছি না।
অহং গন্তুং ন শক্নোমি।
আমি যেতে পারছি না।
বিষয়স্য বর্ধনং মাস্তু।
কথা বাড়াবেন না।

ভালো কথা

জীবসেবা

রাতেরবেলা মায়ের সঙ্গে টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা হলো আমার ছোটবেলার দিদিমণির সঙ্গে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাতে ব্যাগ নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন? তখন দিদিমণি হাতের ব্যাগ খুলে দেখালো তাতে অনেকগুলো রুটি। রাস্তায় থাকা যেসব কুকুরের বাচ্চা হয়েছে তাদের খাওয়াবে। আমি বললাম আমিও যাবো। সেদিন আমরা অনেকক্ষণ ধরে কুকুরগুলিকে খাইয়েছি। মা হলে সমস্তজীবের পেটভরে খাওয়া উচিত। কিন্তু রাস্তায় থাকা কুকুরদের কেউ খেতে দেয় না। তাদের খুব কষ্ট হয়। দিদিমণির সঙ্গে এই কাজ করতে পেরে আমি খুব খুশি।

উর্মিলা চন্দ, বক্সিরহাট, কোচবিহার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) নি ত কে ন্তি ন	(১) থ রি প গি
(২) ব ং হ কা স	(২) ভ শ ক্ত দে

২৩ অক্টোবরের সংখ্যার উত্তর
(১) অনুসন্ধান (২) অমরাবতী

২৩ অক্টোবরের সংখ্যার উত্তর
(১) কাপুরুষ (২) দারোয়ান

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (২) প্রিয়াংশু পতি, খাতড়া, বাঁকুড়া। (৩) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬। (৪) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ১

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

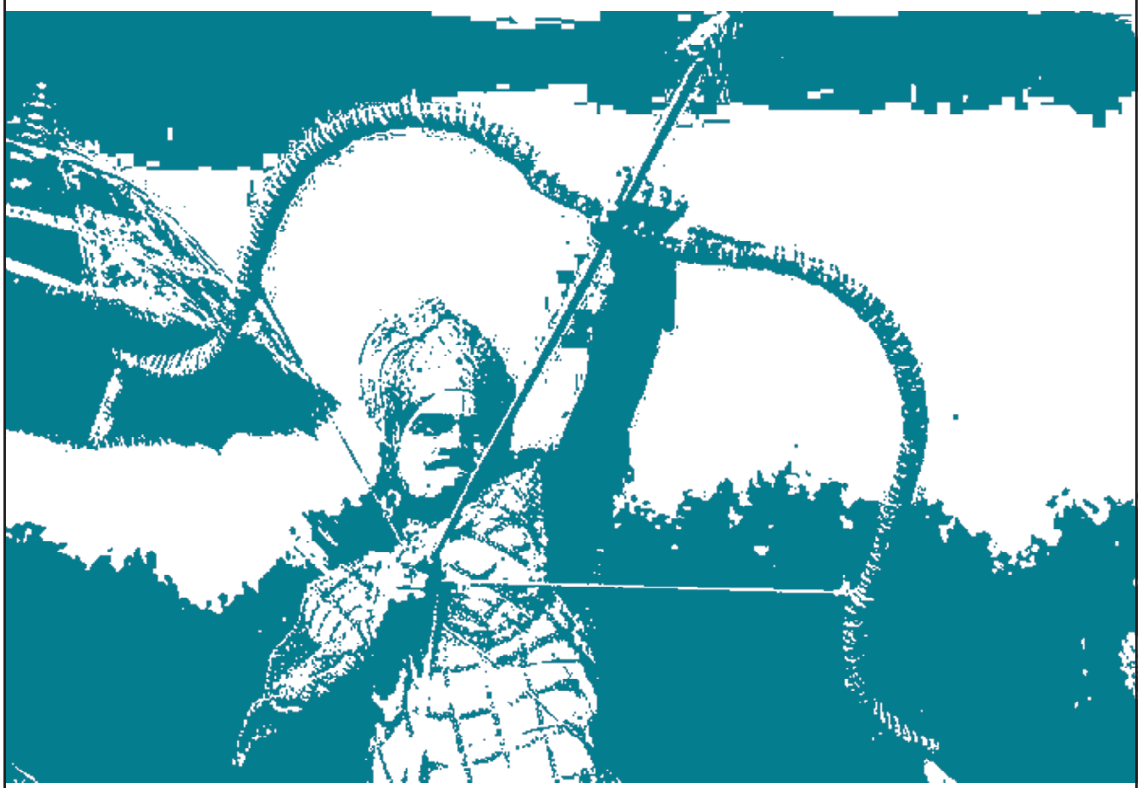

ক্রমশঃ

শব্দরূপ-৮৪১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	২	৩		৪	■	■	৫
■	৬		■		■	৭	
■		■	■	৮	৯	■	■
১০		১১	■	১২			১১
■	■	১৩	১৪	■	১৫	১৬	
১৭	১৮			■	■		■
১৯		■		■	২০		■
	■	■	২১				

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. জটিল পথ, যার শেষ বের করা কঠিন; জটিল সমস্যা, ৬. নিশানা, ৭. গোলাকার বস্তুতে শক্তি, ৮. শুভ্রতার লক্ষণ প্রকাশ, ১০. ঔষধাদির জন্য গাছগাছড়া, ১২. স্তূপ, গাদা, ১৩. বিবাহের পাত্র, ১৫. "আমি তখন ছিলাম—গহন ঘুমের ঘোরে/যখন বৃষ্টি নামল", ১৭. অশ্ব, ১৯. বশীকরণাদির জন্য তন্ত্রমন্ত্র, জাদু, ২০. সরু রাস্তা, ২১. মাস্তুল।

উপর-নীচ : ২. নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার, ৩. প্রকোষ্ঠ,ঘর, ৪. খোশামুদে, ৫. পাকা চুল কালো করার রং, ৭. হত্যা, ৯. ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম, ১১. মলক্কা দ্বীপের বৃক্ষ বিশেষ ও তার সুগন্ধ পুষ্প এর অন্য নাম দেবকুসুম, ১৪. ব্যবসার এই রকম অবস্থা মানে খুবই ভালো, ১৬. ভেড়ার পাল, ১৭. সাপুড়িয়া ও বাজিগরদের বাঁশী, ১৮. ঘরের সামনে পাকা দালান; চবুতরা, ২০. একটি রবিশস্য।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৮

■	■	ম	হা	শ্বে	তা	দে	বী
ধা	ব	ক	■	ত	■	■	ভা
র	■	র	■	সা	জ	ঘ	র
ক	ল	কে	■	র	ব	■	■
■	■	ত	ট	■	র	জ	নী
ম	হা	ন	স	■	জ	■	হা
হে	■	■	ট	■	ব	হ	র
শ	ক	টে	স	ম্ভা	র	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল, সাহাপুর, মালদা
সুশীল কয়াল, তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

□ ৮৪১ সংখ্যার সমাধান পরের সংখ্যায়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
6 November - 2017 - Rs. 10.00,
Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।